# জীবন-বিজ্ঞান

কুণ্ডু • দাশ • কুণ্ডু

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা-পর্ষৎ প্রবর্তিত নূতন পাঠ্যসূচী অনুযায়ী, অষ্টম শ্রেণীর জন্য অনুমোদিত (T.B.76/8/LS/15 Dated 30/12/76.)

# জীবন-বিজ্ঞান

[ তৃতীয় ভাগ ]



**শ্রীমতী দেবী কুণ্ডু,** এম.এস-সি. (কলিকাতা),
এম.এস-সি (ব্রুনেল), পি-এইচ.ডি. (কলিকাতা)
জীব-বিজ্ঞানের প্রাক্তন শিক্ষিকা, বিনোদনী গার্লস হাই স্কুল (কলিকাতা) ;
মুরলীধর গার্লস হাই স্কুল (কলিকাতা)।

**শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাশ,** এম.এস-সি.
জীব-বিজ্ঞানের প্রাক্তন শিক্ষক, অক্ষয় শিক্ষায়তন (হাওড়া)।

**শ্রীকল্যাণ কুমার কুণ্ডু,** এম.এস-সি. (স্বর্ণপদকপ্রাপ্ত), ডি.ফিল.
(কলিকাতা), পি-এইচ.ডি. (লণ্ডন)
গবেষক, উদ্ভিদ-বিজ্ঞান বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ;
প্রাক্তন অধ্যাপক, বঙ্গবাসী কলেজ।

ভা র তী বু ক স্ট ল
প্রকাশক ও পুস্তক-বিক্রেতা
রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা-9

প্রথম প্রকাশ ঃ জানুয়ারি, 1976।
তৃতীয় সংস্করণ ঃ মার্চ, 1977।

চিত্রসজ্জা ঃ

শ্রীচিত্রকুমার রায়।
শ্রীপরেশনাথ মুখোপাধ্যায়।
৺মনোমোহন চক্রবর্তী।
শ্রীবীরেন দাস।



মূল্য ঃ 3 টাকা 50 পয়সা মাত্র।

(ভারত সরকার-প্রদত্ত স্বল্পমূল্য কাগজে মুদ্রিত)

শ্রীপ্রবীরকুমার বারিক কর্তৃক 7-B, সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট, কলিকাতা-9 হইতে প্রকাশিত ও শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাস কর্তৃক 9A, মনমোহন বসু স্ট্রীট, কলিকাতা বাণীরূপা প্রেস হইতে মুদ্রিত।

Dalai Roy.



## ভূমিকা

"জীবন-বিজ্ঞান"—তৃতীয় ভাগ প্রকাশিত হল। এই বই-এ পাঠ্য-নির্ঘণ্টের ...করিক রূপায়ণের দিকে জোর না দিয়ে, মূল বক্তব্যের কেন্দ্রীয় ভাবের যথাযথ ...ানের চেষ্টা করা হয়েছে। সহজবোধ্য ভাষায় বিজ্ঞানের আধুনিক স্বীকৃত ... পরিবেশনের দিকে সজাগ দৃষ্টি রেখেছি। পর্ষদের নির্দেশ অনুযায়ী, ...দণ্ডী প্রাণী কুনো ব্যাঙের বর্ণনা প্রসঙ্গে মানুষের বিষয়েও উল্লেখ করেছি। ...কাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত "বৈজ্ঞানিক পরিভাষা" অনুসরণ করা ...ছে। বানানের জন্য আমরা শ্রদ্ধেয় রাজশেখর বসু সংকলিত **চলন্তিকা** ...সরণ করেছি।

পাণ্ডুলিপি প্রস্তুতিতে অক্লান্ত সাহায্য করেছেন শ্রীমতী মঞ্জুষা দাশ। তাঁর ...ছে আমরা কৃতজ্ঞ।

আশা করি, "জীবন-বিজ্ঞান"-এর অন্যান্য খণ্ডগুলির মতো এই খণ্ডটিও ...লের সমাদর পাবে। বইটির ত্রুটি-বিচ্যুতি এবং উন্নতিকল্পে সৎ-পরামর্শের ... সকলকে সাদর আমন্ত্রণ জানাই।

কলকাতা,
1 জানুয়ারি, 1976

শ্রীমতী দেবী কুণ্ডু
শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাশ
শ্রীকল্যাণ কুমার কুণ্ডু

## তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকা

"জীবন-বিজ্ঞান"—তৃতীয় ভাগের বর্তমান সংস্করণ পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা ...দের নির্দেশ অনুসারে সংশোধিত ও পরিমার্জিত করা হল। বর্তমান ...স্করণে ভাষা আরোও প্রাঞ্জল করা হয়েছে এবং সেই সঙ্গে কয়েকটি নূতন ...য়ও সংযোজন করা হয়েছে। আশা করি এই সংস্করণও সকলের কাছে ...াদৃত হবে।

কলিকাতা,
30 মার্চ 1977

শ্রীমতী দেবী কুণ্ডু
শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাশ
শ্রীকল্যাণ কুমার কুণ্ডু

## SYLLABUS IN LIFE SCIENCE

### CLASS VIII

(1) Structure of plant and animal cells.

(2) Histology :—Plant tissue, structure of stem (dicot and monocot), root (dicot and monocot) and leaf. [10 pages]

(3) Animal tissues and organs. [15 pages]

(4) Outline idea of different systems with functions :—

(a) Invertebrate—cockroach and earthworm. [15 pages]

(b) Vertebrate—toad (frequent reference will have to be made to the organ systems in human being). [20 pages]

(5) Phenomenon of diffusion, osmosis, absorption, conduction, transpiration in plants. [15 pages]

(6) Students should acquire individual experience by experimentation on the following items :—

Section of Stem, root and leaf. External structure of cockroach. External structure and general viscera of toad. [10 pages]

[10% deviation allowed]

---

সূচীপত্র

# পরিভাষা

অংশফলক—Scapula

অংসতুণ্ড—Coracoid

অক্ষক—Clavicle

অক্ষীয় কঙ্কাল—Axial skeleton

অগ্ন্যাশয়—Pancreas

অগ্ন্যাশয়-নালী—Pancreatic duct

অগ্রবক্ষ—Pro-thorax

অগ্র-মহাশিরা—Pre-caval vein

অঙ্ক-পর্দা—Ventral septum

অঙ্ক-মধ্যরেখা—Midventral line

অঙ্ক-রক্তবাহ—Ventral blood vessel

অঙ্কীয় নার্ভ-সূত্র—Ventral nerve cord

অঙ্গ—Organ

অঙ্গতন্ত্র—Organ system

অঙ্গুলিনলক—Phalanges

অজীবীয় বস্তু—Ergastic substances

অণুচক্রিক—Blood platelets

অধঃ-নার্ভ রক্তবাহ—Subneural blood vessel

অধস্ত্বক্—Hypodermis

অনাল গ্রন্থি—Ductless gland

অনুদৈর্ঘ্য সর্পিল কপাটক—Longitudinal spiral valve

অনুপ্রস্থ—Transverse

অনৈচ্ছিক পেশী—Involuntary muscle

অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিতন্ত্র—Endocrine system

অন্তঃস্থ নাসারন্ধ্র—Internal nares

অন্তর্বাহী নার্ভ—Afferent nerve

অন্ত্র—Intestine

অন্ননালী—Oesophagus

অন্ননালী-ঊর্ধ্ব নার্ভ-গ্রন্থি—Supraoesophageal nerve-ganglion

অন্ননালী-নিম্ন নার্ভ-গ্রন্থি—Suboesophageal nerve-ganglion

অন্ননালী-পার্শ্বীয় রক্তবাহ—Lateral oesophageal blood vessel

অবসারণী—Cloaca

অবসারণী-ছিদ্র—Cloacal aperture

অভিনেত্র—Eye-piece

অভিলক্ষ্য—Objective

অরীয়—Radial

অর্ধচন্দ্রাকার কপাটক—Semilunar valve

অস্থি—Bone

অস্থিতন্ত্র—Osseous system

অস্থিমজ্জা—Bone marrow

আদিকলা—Ground tissue, Fundamental tissue

আদিকলাতন্ত্র—Fundamental tissue system, Ground tissue system

আনুষঙ্গিক স্পন্দনশীল অঙ্গ—Accessory pulsatile organ

আন্তঃকোষীয় রন্ধ্র—Intercellular space

আন্তরযন্ত্র—Viscera

আন্ত্রিক—Intestinal

আবরণ—Sheath

আবরণী কলা—Epithelial tissue

আবরণী কাচ—Cover glass
আভেদ্য পর্দা—Semipermeable membrane
আয়ন-বিনিময়—Ion exchange
আসঞ্জন—Adhesion
আস্রবণ—Osmosis
উচ্চশক্তি-সম্পন্ন—High power
উদর-নার্ভ-গ্রন্থি—Abdominal nerve-ganglion
উদর-শ্বাসছিদ্র—Abdominal spiracle
উদ্ভিদ-কলা—Plant tissue
উদ্ভিদ-কোষ—Plant cell
উপরিস্থাপন—Mounting
উপরের চোয়াল—Upper jaw
উপশিরা—Venule
উপাঙ্গিক কঙ্কাল—Appendicular skeleton
উরঃফলক—Sternum
উরশ্চক্র—Pectoral girdle
উর্ধ্ব-ত্বক—Upper epidermis
উর্বস্থি—Femur
এককোষী—Unicelluar
ঐচ্ছিক পেশী—Voluntary muscle
কঙ্কাল—Skeleton
কঙ্কাল-তন্ত্র—Skeletal system
কঠিন শকল—Hard bast
কণ্ডরা—Tendon
কপাটক—Valve
করকূর্চাস্থি—Metacarpals
করোটি—Skull
করোটিক নার্ভ—Cranial nerve
করোটিকা—Cranium
কলা—Tissue
কলাতন্ত্র—Tissue systen
কলাস্থান—Histology
কশেরুকা—Vertebra
কাচিক কোমলাস্থি—Hyaline cartilage
কার্যগত একক—Functional unit
কুঁজ—Hump
কুনো ব্যাঙ—Toad
কেন্দ্রীয় নার্ভ-তন্ত্র—Central nervous system
কোমলাস্থি—Cartilage
কোলা ব্যাঙ—Frog
কোষ—Cell
কোষ-তত্ত্ব—Cell theory
কোষদেহ—Cell-body
কোষ-প্রাকার—Cell-wall
কোষ-বিভাজন—Cell-division
কোষরস—Cell-sap
কোষান্তর আস্রবণ—Cell to cell osmosis
ক্লোমনালিকা—Trachea
ক্লোমশাখা—Bronchus
ক্ষরণ—Secretion
ক্ষারীয়—Alkaline
ক্ষুদ্রান্ত্র—Small intestine
ক্ষেপণনালী—Ejaculatory duct
খণ্ডকস্থ বাহ—Segmental vessel
খাদ্য-গ্রহণ—Feeding

গঠনগত একক—Structural unit
গড়ু—Wart
গবিনী—Ureter
গলবিল—Pharynx
গলবিল-ঊর্ধ্ব—Supra-pharyngeal
গলবিল-কন্দ—Pharyngeal bulb
গলবিল-নিম্ন—Subpharyngeal
গুরুমস্তিষ্ক—Cerebrum
গুল্‌ফাস্থি—Tarsals
গ্রন্থি-নালী—Glandular duct
গ্রহণী—Duodenum
চিহ্নিত করা—Labelling
চেষ্টীয় নার্ভ—Motor nerve
ছেদ—Section
ছেদ কাটা—Section cutting
জটিল স্থায়ী কলা—Complex permanent tissue
জনন-অঙ্গ—Reproductive organ
জনন-ছিদ্র—Genital aperture
জনন-তন্ত্র—Reproductive system
জনন-থলি—Genital pouch
জনন-পিড়কা—Genital papilla
জরায়ু—Uterus
জাইলেম বাহিকা—Xylem vessel
জীবনের একক—Unit of life
ডিম্ব—Egg
ডিম্বচুঙ্গী—Oviducal funnel
ডিম্বথলি—Ovisac
ডিম্বনালী—Oviduct
ডিম্বাণু—Ovum
ডিম্বাশয় নালিকা—Ovariole
তঞ্চন—Coagulation
তন্তুময় কোমলাস্থি—Fibruous cartilage
তন্তুময় যোগ-কলা—Fibrous connective tissue
তরুণাস্থি—Cartilage
তৈল-গ্রন্থি—Oil gland
ত্বক্—Epidermis
ত্বক্-কলাতন্ত্র—Epidermal tissue system
দক্ষিণ অলিন্দ—Right auricle
দীর্ঘচ্ছেদ—Longitudinal section
দেহ-গহ্বর—Body-cavity
দেহ-প্রাকার—Body-wall
দ্বিলিঙ্গ—Bisexual
দ্রবণ—Solution
দ্রাব—Solute
দ্রাবক—Solvent
ধমনিকা—Arteriole
ধমনী—Artery
ধমনী-তন্ত্র—Arterial system
ধাত্র—Matrix
নার্ভ-অঙ্গুরী—Nerve ring
নার্ভ-কলা—Nervous tissue
নার্ভ-কোষ—Nerve cell
নার্ভ-গ্রন্থি—Nerve ganglion
নার্ভ-তন্তু—Nerve fibre
নার্ভ-তন্ত্র—Nervous system
নার্ভ-সূত্র—Nerve cord
নালিকা বাণ্ডিল—Vascular bundle
নাসাপথ—Nasal passage
নিচের চোয়াল—Lower jaw
নিম্ন ক্ষুদ্রান্ত্র—Ileum
নিম্ন-ত্বক্—Lower epidermis
নিম্নশক্তি-সম্পন্ন—Low power
নিলয়—Ventricle
পদ—Leg

পদকূর্চাস্থি—Metatarsal
পরাঙ্মস্তিষ্ক—Hind brain
পরি-অন্ননালীয় নার্ভ-যোজক—Circum-oesophageal connectives
পরি-গলবিলীয় নার্ভ-যোজক—Peri-pharyngeal connective
পরিবহণ—Conduction
পর্দা—Septum
পশ্চাৎ-বক্ষ—Metathorax
পশ্চাৎ-বক্ষ-শ্বাসছিদ্র—Metathoracic spiracle
পশ্চাৎ-মহাশিরা—Post-caval vein
পাকস্থলী—Stomach
পাকস্থলী-ঊর্ধ্ব রক্তবাহ—Supragastric blood vessel
পাচক রস—Digestive juice
পিত্ত—Bile
পিত্তাশয়—Gall-bladder
পিত্তাশয়-নালী—Cystic duct
পীত তন্তু—Yellow fibre
পুং-জনন-অঙ্গ—Male reproductive organ
পুং-জনন-ছিদ্র—Male gonopore
পুং-জনন-তন্ত্র—Male reproductive system
পুরোমস্তিষ্ক—Fore brain
পুষ্টিতন্ত্র—Alimentary system, Digestive system
পৃষ্ঠ-পর্দা—Dorsal septum
পৃষ্ঠবাহ—Dorsal vessel
পৃষ্ঠ-মহাধমনী—Dorsal aorta
পৃষ্ঠ-রক্তবাহ—Dorsal blood vessel
পেশী-কলা—Muscular tissue
পেশীতন্ত্র—Muscular system
পোর্টাল-তন্ত্র—Portal system
পৌষ্টিক নালী—Alimentary canal
প্রগণ্ডাস্থি—Humerus
প্রজন-কাল—Breeding season
প্রতিবর্ত ক্রিয়া—Reflex action
প্রতিবিম্ব—Image
প্রস্তর-কোষ—Stone cell
প্রস্থচ্ছেদ—Transverse section
প্রাণিকলা—Animal tissue
প্রাণিকোষ—Animal cell
প্রান্তঃস্থ নার্ভ-তন্ত্র—Peripheral nervous system
প্রান্তীয় প্যারেন্কাইমা—Bordar parenchyma
প্লীহা—Spleen
ফুস্ফুস-ধমনী—Pulmonary artery
ফুস্ফুস-শিরা—Pulmonary vein
বংশগতি—Heredity
বক্ষ-নার্ভ-গ্রন্থি—Thoracic nerve-ganglion
বক্ষ-শ্বাসছিদ্র—Thoracic spiracle
বদ্ধ—Closed
বলয়-সমাবেশ—Ringed arrangement
বহুকোষী—Multicellular

বহিঃস্থ নাসারন্ধ্র—External nasal aperture
বহির্বাহী নার্ভ—Efferent nerve
বাগ্‌যন্ত্র—Larynx
বাতাবকাশ—Air space
বাণ্ডিল-আবরণ—Bundle sheath
বাণ্ডিল টুপী—Bundle cap
বাম অলিন্দ—Left auricle
বায়ুথলি—Air sac
বাষ্পমোচন—Transpiration
বাহ্য গঠন—External structures
বিক্ষিপ্ত সমাবেশ—Scattered arrangement
বিপাকীয় ক্রিয়া—Metabolic activitives
বিষমসারক রেখা—Anisotropic band
বৃক্ক—Kidney
বৃক্ক-ধমনী—Renal artery
বৃক্ক-নালিকা—Renal tubules
বৃক্ক-পোর্টাল তন্ত্র—Renal portal system
বৃক্ক-পোর্টাল শিরা—Renal portal vein
বৃক্ক-শিরা—Renal vein
বৃহদন্ত্র—Large intestine
ব্যবচ্ছেদ—Dissection
ব্যাঙের ছাতা-আকার গ্রন্থি—Mushroom-shaped gland
ব্যাপন—Diffusion
ভাজক কলা—Meristematic tissue
ভিত্তি-পর্দা—Basement membrane
ভেদ্য পর্দা—Permeable membrane
মজ্জা—Pith, Medulla
মজ্জাংশু—Pith-rays, Medullary rays
মণিবন্ধাস্থি—Carpals
মধ্যবক্ষ—Mesothorax
মধ্যবক্ষ-শ্বাসছিদ্র—Mesothoracic spiracle
মধ্যমস্তিষ্ক—Midbrain
মল—Faeces
মলাশয়—Rectum
মস্তিষ্ক—Brain
মহাধমনী—Aorta
মহাবিবর—Foramen magmum
মহাশিরা—Caval vein
মিশ্র-নার্ভ—Mixed nerve
মুক্ত—Open
মুখ-বিবর—Buccal cavity
মূত্র—Urine
মূত্রাশয়—Urinary bladder
মূল-চাপ—Root pressure
মেদকলা—Adipose tissue
মেদপুঞ্জ—Fat bodies
যকৃৎ—Liver
যকৃৎ-অগ্ন্যাশয়-নালী—Hepatopancreatic duct
যকৃৎ-নালী—Hepatic duct
যকৃৎ-পোর্টাল—Hepatic portal
যকৃৎ-শিরা—Hepatic vein

যোগ-কলা—Connective tissue
যোজক কলা—Conjunctive tissue
যোনি—Vagina
রক্ত—Blood
রক্ত-কণিকা—Blood corpuscles
রক্ত-জালক—Blood capillary
রক্তবাহ—Blood vessel
রক্তমস্ত—Plasma
রক্তরস—Plasma
রক্ত-সংবহন-তন্ত্র—Blood vascular system
রক্ষী কোষ—Guard cell
রঞ্জক—Pigment
রজন-নালী—Resin duct
রসের উৎস্রোত—Ascent of sap
রুধিরকণিকা—Blood corpuscles
রেখা-বিহীন পেশী—Nonstriated muscle, Smooth muscle
রেচন-জনন-ছিদ্র—Urino-genital aperture
রেচন-জনন-নালী—Urino-genital duct
রেচন-তন্ত্র—Excretory system
রোম—Hair
লঘুমস্তিষ্ক—Cerebellum
লসিকা—Lymph
লসিকায়নী—Lymph vessels
লালা—Saliva
লালা-গ্রন্থি—Salivary gland
লালাধার—Salivary receptacle
লালাধার-নালী—Receptacular duct
লালা-নালী—Salivary duct
লালাযন্ত্র—Salivary apparatus
লোহিত রক্তকণিকা—Red blood corpuscle
শারীরবৃত্তীয়—Physiological
শিরদাঁড়া—Spinal column
শিরা—Vein
শিরা-তন্ত্র—Venous system
শুক্রচুঙ্গী—Seminal funnel
শুক্রথলি—Seminal vesicle
শুক্রধানী—Spermatheca
শুক্রধানী-ছিদ্র—Spermathecal aperture
শুক্রনালী—Vas deferens
শুক্রাণু—Sperm
শুক্রাশয়—Testis
শুক্রাশয়-থলি—Testis sac
শোষণ—Absorption
শোষণ-চাপ—Suction pressure
শ্বসন-তন্ত্র—Respiratory system
শ্বাসছিদ্র—Spiracle
শ্বাসনালিকা—Tracheole
শ্বাসনালী—Trachea
শ্বাসনালী-তন্ত্র—Tracheal system
শ্বাসরন্ধ্র—Glottis
শ্বেত তন্তু—White fibre
শ্বেত রক্তকণিকা—White blood corpuscles
শ্বেতসার—Starch
শ্রোণীচক্র—Pelvic girdle
শ্লেষ্মঝিল্লী—Mucous membrane
শ্লেষ্মা—Mucus

সংবহন-কলা—Conducting tissue
সংবহন-কলাতন্ত্র—Vascular tissue system
সংবহন-তন্ত্র—Circulatory system
সংবেদ-নার্ভ—Sensory nerve
সংযুক্ত—Conjoint
সংসক্তি—Cohesion
সঙ্কোচী—Contractile
সঙ্গী কোষ—Companion cell
সন্ধিপদী—Arthropod
সন্ধিবন্ধনী—Ligament
সমন্বয়ন—Adjustment
সমপার্শ্বীয়—Collateral
সমসারক রেখা—Isotropic band
সমাবতল ক্ষুর—Plano-concave razor
সরল আবরণী কলা—Simple epithelial tissue
সরল স্থায়ী কলা—Simple permanent tissue
সরেখ পেশী—Striated muscle
সাধারণ কূপ—Simple pit
সাধারণ গ্রন্থি-নালী—Common glandular duct
সাধারণ ডিম্বনালী—Common oviduct
সাধারণ পিত্তনালী—Common bile-duct
সাধারণ ফুসফুস-শিরা—Common pulmonary vein
সাধারণ লালাধার-নালী—Common receptacular duct
সীভ নল—Sieve tube
সুষুম্নাকাণ্ড—Spinal cord
সুষুম্না-নার্ভ—Spinal nerve
সুষুম্নাশীর্ষক—Medulla oblongata
সূক্ষ্ম সন্নিবেশক স্ক্রু—Fine adjustment screw
স্তরীভূত আবরণী কলা—Stratified epithelial tissue
স্ত্রী-জনন-অঙ্গ—Female reproductive organ
স্ত্রী-জনন-ছিদ্র—Female gonopore
স্ত্রী-জনন-তন্ত্র—Female reproductive system
স্থায়ী কলা—Permanent tissue
স্থিতিস্থাপক—Elastic
স্থূল সন্নিবেশক স্ক্রু—Coarse adjustment screw
স্বতঃক্রিয় নার্ভ-তন্ত্র—Autonomic nervous system
স্বরতন্ত্রী—Vocal cord
স্বরথলি—Vocal sac
স্বেদ-গ্রন্থি—Sweat gland
হাইঅয়েড যন্ত্র—Hyoid apparatus
হৃৎ-ঘাত—Heart beat
হৃৎপিণ্ড—Heart
হৃৎ-পেশী—Cardiac muscle
হ্যাভারশিয়ান নালী—Haversian canal
হ্যাভারশিয়ান মণ্ডল—Haversian system

# উদ্ভিদ-কোষ ও প্রাণিকোষের গঠন





সপ্তম শ্রেণীতে নানারকম জীবের কথা বলা হয়েছে। বাইরে থেকে দেখে নানা ধরনের জীবকে কি করে চিনতে হয়, সেবিষয়ে, এবং কয়েকটি জীবের বাহ্য গঠন সম্পর্কেও আলোচনা করা হয়েছে। যদি প্রশ্ন করা হয়, জীব কি দিয়ে তৈরী? তাহলে হয়তো উত্তর পাওয়া যাবে— বটগাছ, আমগাছ ইত্যাদি উদ্ভিদ কাঠ, বাকল ইত্যাদি দিয়ে তৈরী, আর জন্তু-জানোয়ারেরা রক্ত, মাংস, হাড়, প্রভৃতি দিয়ে তৈরী। একথা, অবশ্য, ঠিক। তবু প্রশ্ন থেকে যায়— কাঠ, রক্ত, মাংস, হাড় কি দিয়ে তৈরী? এরা সবই খুব ছোট ছোট কুঠুরির মতো অসংখ্য অংশ দিয়ে গঠিত। এগুলির নাম **কোষ**। অর্থাৎ, জীবদেহ-মাত্রই কোষ দিয়ে গঠিত। এইজন্য কোষকে জীবের **গঠনগত একক** বলা হয়।

কোষ খুব ছোট বলে, খালি চোখে দেখা যায় না। কোষ দেখতে হলে, অণুবীক্ষণ যন্ত্র নামে একরকম যন্ত্রের সাহায্যের প্রয়োজন। 1665 খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজ বিজ্ঞানী **রবার্ট হুক** (Robert Hooke) অণুবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কার করেন। তিনি এক টুকরা বোতলের ছিপি* খুব পাতলা করে কেটে, ঐ অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা করে দেখলেন যে, ছিপি আসলে অনেকগুলি ছোট ছোট কুঠুরির মতো অংশ দিয়ে তৈরী। তিনি কুঠুরির মতো অংশগুলির নাম দিলেন **সেল** (Cell)। বাংলায় সেলকে **কোষ** বলা হয়। বিজ্ঞানী হুক, অবশ্য, কোষের কেবল মৃত কাঠামোই দেখতে পেয়েছিলেন। অন্যান্য বিজ্ঞানীদের চেষ্টায় ক্রমে ক্রমে কোষের মধ্যে নানা ধরনের জীবিত বস্তু আবিষ্কৃত হয়। এই সমস্ত আবিষ্কারের ফলে, 1839 খ্রীষ্টাব্দে **স্লাইডেন** (Schleiden) এবং **সোয়ান** (Schwann) নামের দুজন জার্মান বিজ্ঞানী **কোষ-তত্ত্ব** (Cell theory) নামের বিখ্যাত তত্ত্ব প্রবর্তন করেন।

---

* এক ধরনের ওক(Oak)-জাতীয় গাছের পুরু বাকল থেকে বোতলের ছিপি তৈরী হয়।

এই তত্ত্বে বলা হয়েছে যে, সমস্ত জীব-ই কোষ এবং কোষজাত বস্তু দিয়ে তৈরী।

**কোষের মৌলিক গঠন :** কোষ আসলে **প্রোটোপ্লাজ্‌ম** (Protoplasm) নামের এক ধরনের সজীব বস্তু দিয়ে গঠিত। কোষের প্রোটোপ্লাজ্‌ম একটি পর্দা দিয়ে বেষ্টিত থাকে। এই পর্দার নাম **প্লাজ্‌মা মেমব্রেন** (Plasma membrane)। এই পর্দা কোষের সজীব অংশ এবং খুবই সূক্ষ্ম (এক মিলিমিটারের এক লক্ষ ভাগের এক ভাগের থেকেও পাতলা)। বাইরে থেকে কোনও বস্তুর কোষে প্রবেশ, এবং কোষ থেকে কোনও বস্তুর কোষের বাইরে যাওয়া নিয়ন্ত্রণ করাই প্লাজ্‌মা মেম্‌ব্রেনের কাজ। এই পর্দা সাধারণ পর্দার মতো নয়। এর মধ্য দিয়ে কতকগুলি বস্তু সহজে যেতে পারে ; কিন্তু, কিছু কিছু বস্তু আদৌ যেতে পারে না, অথবা গেলেও, সহজে যেতে পারে না। এই বিশেষ ক্ষমতার জন্য প্লাজ্‌মা মেম্‌ব্রেনকে **আভেদ্য** বলা হয়।

কোষের সাইটোপ্লাজ্‌মকে খুব সহজে দুভাগে ভাগ করা যায়—**সাইটোপ্লাজ্‌ম** (Cytoplasm) এবং **নিউক্লিয়াস** (Nucleus)। সাইটোপ্লাজ্‌ম দেখতে কতকটা জেলির মতো এবং ঈষদচ্ছ (অর্থাৎ, এর ভিতর দিয়ে অল্প পরিমাণে আলো যেতে পারে)। জীবিত কোষের সাইটোপ্লাজ্‌মকে অনেক সময় নড়াচড়া করতে দেখা যায়। নিউক্লিয়াস এবং আরও নানারকম (পরে দ্রষ্টব্য) সজীব ও জড় বস্তু ধারণ করা সাইটোপ্লাজ্‌মের প্রধান কাজ। সাইটোপ্লাজ্‌মে প্রচুর পরিমাণে **আর.এন.এ.** (RNA) অর্থাৎ, **রাইবোনিউক্লিক অ্যাসিড** (Ribonucleic Acid) থাকে। আর.এন.এ. প্রোটীন(Protein)-সংশ্লেষে সাহায্য করে।

কোষের কেন্দ্রে অথবা অন্য কোনও জায়গায়, সাইটোপ্লাজ্‌মের মধ্যে একটি গোলাকার বস্তু থাকে। এরই নাম নিউক্লিয়াস। নিউক্লিয়াসের পরিধিতে একটি সূক্ষ্ম আবরণ থাকে। এর নাম **নিউ-ক্লিয়ার মেমব্রেন** (Nuclear membrane)। নিউক্লিয়াসের মধ্যে ছোট একটি গোলাকার বস্তু দেখা যায়। এর নাম **নিউক্লিওলাস**

(Nucleolus)। নিউক্লিয়াসের মধ্যে সুতার মতো কতকগুলি সূক্ষ্ম বস্তু জট-পাকানো অবস্থায় থাকতে দেখা যায়। এদের নাম **ক্রোমাটিন** (Chromatin)। কোষ-বিভাজন(দশম শ্রেণীর পাঠ্য-নির্ঘণ্টের অন্তর্গত)-এর সময় ক্রোমাটিন থেকে লম্বা লম্বা কতকগুলি সুতার মতো বস্তু সৃষ্টি হয়। এদের নাম **ক্রোমোজোম**(Chromosomes)। ক্রোমোজোমে অসংখ্য সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কণিকা থাকে। এদের নাম **জিন** (Genes)*। জিন ডি.এন.এ. (DNA) অর্থাৎ, **ডিঅক্সিরাইবোনিউক্লিক অ্যাসিড** (Deoxyribonucleic Acid) দিয়ে তৈরী। জিন (অতএব, ডি.এন.এ.) বংশগতি নিয়ন্ত্রণ করে।

নিউক্লিয়াস কোষের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ। কোষের যাবতীয় কাজ পরিচালনা এবং নিয়ন্ত্রণ করা এর কাজ। কোষ থেকে যদি নিউক্লিয়াস বের করে নেওয়া হয়, তবে নিউক্লিয়াস-বিহীন কোষ নষ্ট হয়ে যায়। অবশ্য, সাইটোপ্লাজ্‌ম ছাড়া, নিউক্লিয়াসও বেশি সময় বাঁচতে পারে না।

সাইটোপ্লাজ্‌মে আর এক ধরনের খুব সূক্ষ্ম সজীব বস্তু থাকে। এদের নাম **মাইটোকন্‌ড্রিয়া** (Mitochondria)। এদের আকার সূক্ষ্ম কণা, দণ্ড অথবা সুতার মতো। এরা সাইটোপ্লাজ্‌মের মধ্যে যেখানে সেখানে থাকে। শ্বসনের সময় খাদ্য-বস্তু ভেঙে শক্তি মুক্ত হয়। এই বিক্রিয়া মাইটোকন্‌ড্রিয়ার মধ্যে হয়।

সাইটোপ্লাজ্‌মে আপাতদৃষ্টিতে ফাঁকা যেসব অংশ দেখা যায়, তাদের **কোষ-গহ্বর** বা **ভ্যাকুওল** (Vacuole) বলা হয়। ভ্যাকুওল একটি অথবা অনেকগুলি থাকতে পারে এবং ছোট কিংবা বড় হতে পারে। ভ্যাকুওলের মধ্যে জলের মতো একরকম তরল পদার্থ থাকে। এর নাম **কোষরস**। কোষরসে নানা ধরনের পদার্থ দ্রবীভূত থাকে।

সাইটোপ্লাজ্‌মে স্নেহদ্রব্যের কণা ইত্যাদি কয়েক রকম বড় বস্তুর কণা দেখা যায়। এদের **অজীবীয় বস্তু** (Ergastic matter) বলা হয়।

অতএব দেখা যাচ্ছে, কোষে সচরাচর প্লাজ্‌মা মেমব্রেন, সাইটো-

* জিন, অবশ্য, সাধারণ অণুবীক্ষণ যন্ত্রে দেখা যায় না।

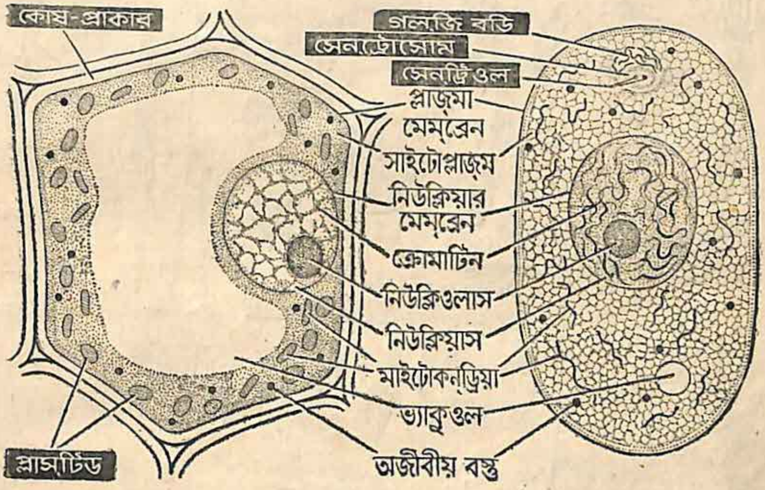
প্লাজ্‌ম, নিউক্লিয়াস, মাইটোকন্‌ড্রিয়া, ভ্যাকুওল এবং অজীবীয় বস্তু থাকে। কিন্তু, [**আবরণ(প্লাজ্‌মা মেম্‌ব্রেন)-বেষ্টিত, নিউক্লিয়াস-যুক্ত সাইটোপ্লাজ্‌মকে কোষ বলা হয়।**]

**উদ্ভিদ-কোষ ও প্রাণিকোষ :** উপরে কোষের যে সব বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হল, সেগুলি উদ্ভিদ-কোষ (অর্থাৎ, উদ্ভিদের কোষ) এবং প্রাণিকোষ (অর্থাৎ, প্রাণীদের কোষ)— এই দুধরনের কোষেই দেখা যায়। কিন্তু, উদ্ভিদ-কোষ ও প্রাণিকোষের কিছু কিছু নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। যেমন—

উদ্ভিদ-কোষের প্লাজ্‌মা মেম্‌ব্রেনের ঠিক বাইরের দিকে দৃঢ়, নির্দিষ্ট এবং জড় বস্তু-নির্মিত একটি পুরু আবরণ থাকে। এর নাম **কোষ-প্রাকার**। কোষ-প্রাকার **সেলুলোজ** (Cellulose) নামের পদার্থ দিয়ে তৈরী। কোষ-প্রাকার থাকায়, উদ্ভিদ-কোষের আকার সব সময় নির্দিষ্ট। উদ্ভিদ-কোষের সাইটোপ্লাজ্‌মে **প্লাস্‌টিড** (Plastids) নামের এক ধরনের সজীব বস্তু থাকে। একরকম প্লাস্‌টিডে **ক্লোরোফিল** (Chlorophyll) নামের সবুজ রঙ্গক কণা থাকে। এইরকম প্লাস্‌টিডের নাম **ক্লোরোপ্লাস্‌টিড** (Chloroplastids) বা **ক্লোরোপ্লাস্‌ট** (Chloroplasts)। সবুজ ছাড়া অন্য রঙের রঙ্গক কণা-যুক্ত দ্বিতীয় ধরনের প্লাস্‌টিডকে **ক্রোমোপ্লাস্‌ট** (Chromoplast) বলে। তৃতীয় ধরনের প্লাস্‌টিডের নাম **লিউকোপ্লাস্‌ট** (Leucoplasts)। এরা বর্ণ-হীন। খাদ্য-প্রস্তুতের সময় ক্লোরোপ্লাস্‌টের সাহায্যের প্রয়োজন হয়। এছাড়া, উদ্ভিদ-কোষের ভ্যাকুওল বেশ বড় হয়।

প্রাণিকোষে কোষ-প্রাকার ও প্লাস্‌টিড থাকে না। তবে, সচরাচর নিউক্লিয়াসের কাছে, সূক্ষ্ম সুতার মতো কতকগুলি বস্তু দল বেঁধে থাকতে দেখা যায়। এদের নাম **গল্‌জি বডি** (Golgi bodies)। কয়েক ধরনের পদার্থ কোষের মধ্যে তৈরী হয়ে, কোষ থেকে বেরিয়ে আসে। এই প্রক্রিয়াকে ক্ষরণ বলে। ক্ষরণে সাহায্য করা গল্‌জি বডির কাজ। অনেক উদ্ভিদ-কোষে, অবশ্য, গল্‌জি বডি থাকে। প্রাণিকোষের নিউক্লিয়াসের কাছে **সেন্‌ট্রোসোম** (Centrosome)

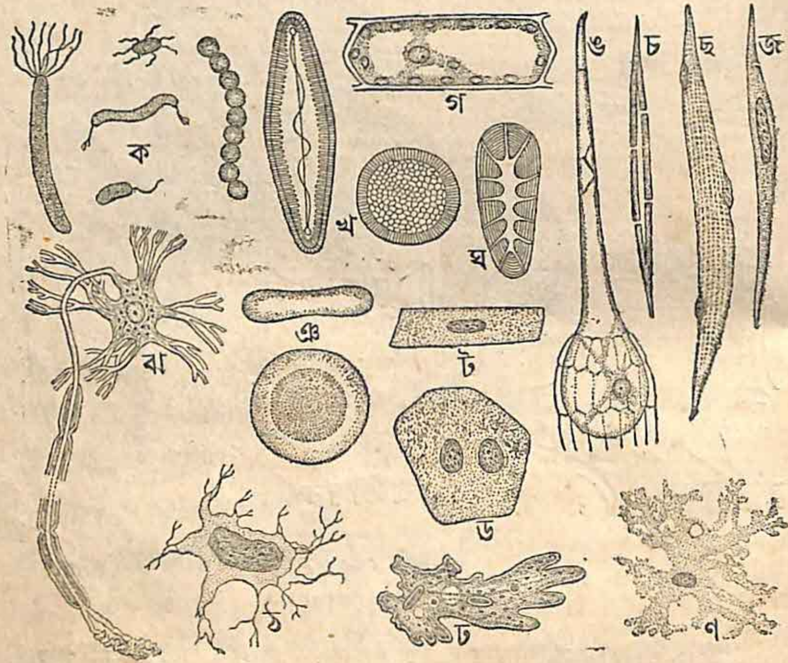
নামের আরও এক ধরনের বস্তু থাকে। এটি স্বচ্ছ অঞ্চল-বিশেষ। এর মধ্যে **সেন্ট্রিওল** (Centrioles) নামের একটি (কখনও কখনও দুটি) সূক্ষ্ম গোলাকার কণা থাকে। সেন্ট্রোসোম এবং সেন্ট্রিওল কোষ-বিভাজনের সময় গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে।




1 নং চিত্র— উদ্ভিদ-কোষ ও প্রাণিকোষের গঠন (বাঁদিকে উদ্ভিদ-কোষ, ডানদিকে প্রাণিকোষ)।

**কোষ জীবনের একক :** অধিকাংশ জীবের দেহ অনেকগুলি কোষ দিয়ে গঠিত। তাই, এদের বলা হয় **বহুকোষী**। কিন্তু, এমনও অনেক জীব আছে, যাদের দেহ মাত্র একটি কোষ দিয়ে গঠিত। এই ধরনের জীবকে বলে **এককোষী**। ঈস্ট (Yeast), অ্যামিবা (*Amoeba*) ইত্যাদি এককোষী জীব। বহুকোষী জীবের দেহ জীবনের যে সমস্ত কাজ করে, এককোষী জীবের একটিমাত্র কোষই সেই সমস্ত কাজ করতে পারে। আসলে, বহুকোষী জীবের কোষগুলিও আলাদা আলাদাভাবে জীবনের যাবতীয় কাজ করতে পারে। সেইজন্য, কোষ জীবের **কার্যগত** একক-ও। আগে বলা হয়েছে, কোষ জীবের গঠনগত একক। অতএব বলা যায়, কোষ **জীবনের একক**, অর্থাৎ কোষই জীব-দেহের সূক্ষ্মতম অংশ, যার মধ্যে জীবনের ধর্ম প্রকাশ পায়।

**কোষের বৈচিত্র্য ঃ** অধিকাংশ কোষ খুবই সূক্ষ্ম (এক মিলি-মিটারের দশভাগের একভাগেরও কম) বলে, খালি চোখে দেখা যায় না। তবে, খালি চোখে সহজে দেখা যায়, এমন বড় কোষও আছে।




2 নং চিত্র— জীব-কোষের বৈচিত্র্য (ক. থেকে চ. পর্যন্ত উদ্ভিদ-কোষ, ছ. থেকে ণ. পর্যন্ত প্রাণিকোষ) : ক. পাঁচ রকম জীবাণু ; খ. দুরকম ডা'য়াটম (Diatoms) নামের এককোষী উদ্ভিদ ; গ. পত্রের ত্বক্-কোষ ; ঘ. প্রস্তর-কোষ ; ঙ. দংশক রোম ; চ. স্কেরেন্‌কাইমা তন্তু ; ছ. সরেখ পেশী-তন্তু ; জ. রেখা-বিহীন পেশী-তন্তু ; ঝ. নার্ভ-কোষ ; ঞ. মানুষের লোহিত রক্তকণিকা (পৃষ্ঠদৃশ্য ও পার্শ্বদৃশ্য) ; ট. মানুষের ত্বক্-কোষ ; ঠ. অস্থি-কোষ ; ড. যকৃৎ-কোষ ; ঢ. এককোষী প্রাণী অ্যামিবা ; ণ. ব্যাঙের চর্মের রঞ্জক কোষ।

উটপাখির ডিমের কুসুম সব থেকে বড় কোষ। এর ব্যাস আশি মিলিমিটার। কয়েক ধরনের নার্ভ(Nerve)-কোষ এক মিটারেরও বেশি লম্বা হয়। অবশ্য, এদের ব্যাস খুবই সূক্ষ্ম। শণ ও তুলার আঁশও খুব লম্বা কোষ। অন্যদিকে, জীবাণু সূক্ষ্মতম কোষের উদাহরণ।

এদের ব্যাস মাত্র কয়েক মাইক্রা (Micra)*। ম্যালেরিয়া (Malaria) রোগের পরজীবীর ব্যাস মাত্র দু'মাইক্রা। প্রাণীদের রক্তকণিকা-ও এক ধরনের কোষ। মানুষের লোহিত রক্তকণিকায় নিউক্লিয়াস থাকে না। আবার, একটি সরেখ পেশী-কোষে কয়েকশ' নিউক্লিয়াস থাকে।

**প্রোটোপ্লাজ্‌মের উপাদান ও বৈশিষ্ট্য :** প্রোটোপ্লাজ্‌মই একমাত্র সজীব বস্তু। প্রোটোপ্লাজ্‌ম থাকায়, কোষ সজীব; তাই জীবেরা-ও সজীব। প্রোটোপ্লাজ্‌ম মোটামুটি পাঁচটি মৌলিক পদার্থ দিয়ে তৈরী। এদের মধ্যে কার্বন (Carbon), হাইড্রোজেন (Hydrogen), নাইট্রোজেন (Nitrogen) এবং অক্সিজেন(Oxygen)-ই প্রধান। মৌলিক পদার্থগুলি, অবশ্য, অসংখ্য যৌগিক পদার্থ হিসাবে থাকে। এই যৌগিক পদার্থের মধ্যে জল, প্রোটীন (Proteins), স্নেহদ্রব্য (Fats), কার্বোহাইড্রেট (Carbohydrates), নিউক্লিক অ্যাসিড (Nucleic acids) এবং খনিজ লবণ ইত্যাদি বেশি পরিমাণে পাওয়া যায়। তাপ দিলে, প্রোটোপ্লাজ্‌ম (ডিমের সাদা অংশের মতো) জমাট বেঁধে যায়। একে তঞ্চন বলে। প্রোটোপ্লাজ্‌ম উত্তেজনায় সাড়া দিতে পারে। এই ধর্মের নাম উত্তেজিতা। মেরুদণ্ডী প্রাণীদের সরেখ পেশীতে কৃত্রিম উপায়ে তড়িৎ-প্রবাহ চালালে, পেশীর কোষগুলি হঠাৎ সঙ্কুচিত হয়। এটি এক রকম উত্তেজিতার উদাহরণ। প্রোটোপ্লাজ্‌মে সব সময় নানা-রকম চলন দেখা যায়। আস্রবণ (পঞ্চম পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য) প্রক্রিয়ায় জলশোষণ করা-ও প্রোটোপ্লাজ্‌মের ধর্ম।

### অনুশীলনী

1. জীব-কোষের প্রধান উপাদান কি কি? এদের কোনটি কি কাজ করে, তা লেখ।

2. সচরাচর উদ্ভিদ-কোষে কি কি বস্তু পাওয়া যায়? সংক্ষেপে এই বস্তুগুলির কাজ লেখ।

---

* বহুবচন; মাইক্রন (Micron)—একবচন। এক মিলিমিটারের এক হাজার ভাগের এক ভাগকে মাইক্রন বলে।

3. উদ্ভিদ-কোষে সাধারণতঃ এমন কি বস্তু থাকে, যা প্রাণিকোষে থাকে না? প্রাণিকোষে থাকে, অথচ উদ্ভিদ-কোষে নেই, এমন একটি বস্তুর নাম কর। এই বস্তুটি প্রাণিকোষের কোথায় থাকে? এর কাজ সম্বন্ধে যা জান, লেখ।

4. উদ্ভিদ-কোষ ও প্রাণিকোষের তফাৎ কি করে করবে, সেবিষয়ে সংক্ষেপে লেখ। উদ্ভিদ-কোষ ও প্রাণিকোষের ছবি এঁকে, এদের বিভিন্ন অংশ চিহ্নিত কর।

5. কোষ জীবনের একক— এই বক্তব্যের সমর্থনে যুক্তি দেখাও।

6. প্রোটোপ্লাজ্‌ম কি কি দিয়ে তৈরী? এর দু-একটি বৈশিষ্ট্যের কথা লেখ।

7. নিচের বক্তব্যগুলির যেটি ঠিক, তার পাশে 'হ্যাঁ' এবং যেটি ভুল, তার পাশে 'না' লেখ:—

(ক) জীবদেহ-মাত্রই কোষ দিয়ে গঠিত; (খ) উদ্ভিদ-কোষে প্লাজ্‌মা মেমব্রেন থাকে না; (গ) সাইটোপ্লাজ্‌মে ডি.এন.এ. (DNA) থাকে; (ঘ) জিন ক্রোমোজোম দিয়ে তৈরী; (ঙ) মাইটোকনড্রিয়া উদ্ভিদ-কোষেও থাকে, প্রাণিকোষেও থাকে; (চ) প্লাসটিড কেবল উদ্ভিদ-কোষেই পাওয়া যায়; (ছ) মানুষের লোহিত রক্তকণিকায় অনেকগুলি করে নিউক্লিয়াস থাকে।

8. শূন্যস্থান পূরণ কর:—

(ক) প্লাজ্‌মা মেমব্রেন কোষের — অংশ; (খ) ক্রোমোজোমে —. এন. এ. থাকে; (গ) ক্রোমোজোমে অসংখ্য সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কণিকা থাকে। এদের নাম —; (ঘ) উদ্ভিদ-কোষের কোষ-প্রাকার — দিয়ে তৈরী; (ঙ) প্লাসটিড —— কোষের বৈশিষ্ট্য; (চ) গল্‌জি বডির কাজ — সাহায্য করা; (ছ) সরেখ পেশী-কোষে — নিউক্লিয়াস থাকে।

9. নিচের প্রথম অনুচ্ছেদের কোনটির সঙ্গে দ্বিতীয় অনুচ্ছেদের কোনটি খাটবে, তা লেখ (যেমন, স্লাইডেন ও সোয়ান কোষ-তত্ত্বের প্রবর্তন করেন। অতএব লিখতে হবে, আ/ঙ)।

(অ) অণুবীক্ষণ যন্ত্র; (আ) স্লাইডেন ও সোয়ান; (ই) প্লাসটিড; (ঈ) মাইটোকনড্রিয়া; (উ) ডি. এন. এ.; (ঊ) উটপাখির ডিমের কুসুম; (ঋ) গল্‌জি বডি।

(ক) ক্রোমোজোম; (খ) শ্বসন; (গ) রবার্ট হুক; (ঘ) উদ্ভিদ-কোষ; (ঙ) কোষ-তত্ত্ব; (চ) প্রাণিকোষ; (ছ) সব থেকে বড় কোষ।

# উদ্ভিদ-কলা　2



এককোষী জীবের একটিমাত্র কোষই জীবনের সবরকম কাজ করতে পারে। কিন্তু, বহুকোষী জীবের জীবনের বিভিন্ন কাজ (যেমন, পুষ্টি, শ্বসন, রেচন ইত্যাদি) করার জন্য ভিন্ন ভিন্ন ধরনের কোষ নির্দিষ্ট থাকে। যেমন— উদ্ভিদের সবুজ পত্রের কোষগুলি সালোক-সংশ্লেষ পদ্ধতিতে খাদ্য প্রস্তুত করে, মানুষের জিহ্বার কোষগুলি স্বাদ গ্রহণ করে।

বহুকোষী জীবের জীবনের শুরু হয় একটিমাত্র কোষ দিয়ে। কোষ-বিভাজনের ফলে, ক্রমে ঐ একটি কোষ থেকে অসংখ্য কোষ সৃষ্টি হয়। নবজাত কোষগুলি সবই এক ধরনের। কিন্তু পরে, কাজের প্রয়োজন অনুসারে, এক এক ধরনের কোষের আয়তন ও আকৃতি এক এক রকম হয়ে যায়। একই ধরনের অনেকগুলি কোষ মিলিতভাবে কোনও নির্দিষ্ট কাজ করলে, ঐ কোষগুলিকে এক ধরনের কলা বলা হয়। কোনও কলার সব কোষগুলি একই আকারের ও আয়তনের হয়। অবশ্য, বিশেষক্ষেত্রে, একই কলায় বিভিন্ন আকার ও আয়তনের কোষ দেখা যেতে পারে। কিন্তু, কোষগুলির আয়তন ও আকার একই হোক অথবা বিভিন্নই হোক, এরা সকলে একইভাবে উৎপন্ন হয় এবং একই নির্দিষ্ট কাজ করে। সুতরাং, **একইভাবে উৎপন্ন এবং একই (অথবা বিভিন্ন) আকারের ও আয়তনের কতকগুলি কোষ নির্দিষ্ট রীতিতে দলবদ্ধভাবে অথবা স্তরে বিন্যস্ত থেকে কোনও নির্দিষ্ট কাজ করলে, ঐ কোষগুলিকে সমষ্টিগতভাবে কলা বলে।**

উন্নততর বহুকোষী জীবের দেহে নানা ধরনের কলা দেখা যায়। বিজ্ঞানের যে শাখায় কলা-বিষয়ে জ্ঞানলাভ করা যায়, তাকে **কলাস্থান** বলে। নিচের অনুচ্ছেদগুলিতে উদ্ভিদ-দেহের প্রধান প্রধান কলা সম্বন্ধে আলোচনা করা হল।

**উদ্ভিদ-কলার প্রকারভেদ ঃ** উদ্ভিদ-দেহে অনেক রকমের কলা দেখা যায়। এদের দুটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়— ভাজক কলা এবং স্থায়ী কলা।

**ভাজক কলা ঃ** এই ধরনের কলার কোষগুলি ছোট ছোট, মোটামুটি সম-ব্যাসযুক্ত এবং ঘন সাইটোপ্লাজ্‌মে পূর্ণ। এদের সাইটোপ্লাজ্‌মে ছোট ছোট কয়েকটি ভ্যাকুওল থাকতে পারে। এই ধরনের কোষের নিউক্লিয়াস খুব বড় এবং কোষ-প্রাকার পাতলা হয়। ভাজক কলার কোষগুলি ক্রমাগত বিভাজিত হতে পারে।

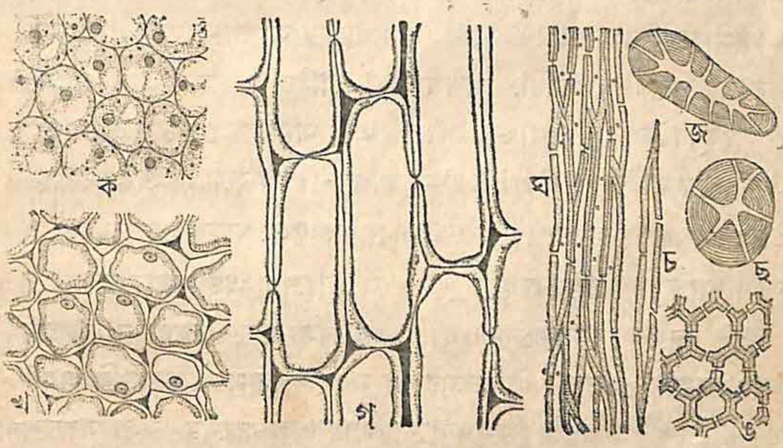
ভাজক কলা সাধারণতঃ উদ্ভিদের মূল অথবা কাণ্ডের ডগায় থাকে। এই কলার কোষগুলি বিভাজনের ফলে উৎপন্ন কোষগুলি থেকে স্থায়ী কলা উৎপন্ন হয় এবং এইভাবে উদ্ভিদ দৈর্ঘ্যে বাড়ে। দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদের কাণ্ডের ও মূলের পরিণত অংশে, স্থায়ী কলার পাশে, লম্বা অক্ষ-বরাবর-ও ভাজক কলা থাকে। এই ধরনের ভাজক কলার কোষ-বিভাজনের ফলে, দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদের কাণ্ড ও মূল মোটা হতে পারে।

***স্থায়ী কলা ঃ*** উদ্ভিদের অধিকাংশ কলা-ই স্থায়ী কলা। এই কলার কোষগুলির নির্দিষ্ট আকার ও আয়তন আছে। এরা বিভাজিত হতে পারে না। কখনও কখনও স্থায়ী কলায় কিছু কিছু মৃত কোষও দেখা যায়। স্থায়ী কলা আবার নানা ধরনের। নিচে এদের বিষয়ে সংক্ষেপে বলা হল।

**প্যারেন্‌কাইমা (Parenchyma) ঃ** এই কলার কোষগুলি সাধারণতঃ গোল, ডিম্বাকার অথবা বহুভুজাকার; তবে, কখনও কখনও লম্বাটেও হয়। এদের কোষ-প্রাকার খুব পাতলা এবং সাইটোপ্লাজ্‌মে বড় বড় ভ্যাকুওল থাকে। প্যারেন্‌কাইমা কলার কোষগুলির অন্তর্বর্তী স্থানে কিছু কিছু ফাঁকা জায়গা থাকে। এদের নাম **আন্তঃকোষীয় রন্ধ্র**। উদ্ভিদের নরম ও রসালো অংশে এই ধরনের কলা পাওয়া যায়। খাদ্য অথবা জল জমা করে রাখা এই কলার

কাজ। সবুজ পত্র ও কাণ্ডের কোমল, সবুজ অংশের পরিধির দিকে যে প্যারেন্‌কাইমা কলা থাকে, তাদের কোষে প্রচুর পরিমাণে ক্লোরোপ্লাস্‌ট থাকে। সেইজন্য, এই কলা সালোকসংশ্লেষ পদ্ধতিতে খাদ্য প্রস্তুত-ও করে।

**কোলেন্‌কাইমা (Collenchyma)ঃ** এই ধরনের কলার কোষগুলি বেলনাকার। এদের কোষ-প্রাকারে বিচ্ছিন্নভাবে এবং বেশি পরিমাণে সেলুলোজ, এবং পেক্‌টিন (Pectin) নামের আর এক ধরনের রাসায়নিক পদার্থ জমা হয়। কোষ-প্রাকারে জায়গায়




3 নং চিত্র— সরল স্থায়ী কলা : ক. প্যারেন্‌কাইমা (প্রস্থচ্ছেদ); খ. কোলেন্‌কাইমা (প্রস্থচ্ছেদ); গ. কোলেন্‌কাইমা (দীর্ঘচ্ছেদ); ঘ. স্ক্লেরেন্‌কাইমা (দীর্ঘচ্ছেদ); ঙ. স্ক্লেরেন্‌কাইমা (প্রস্থচ্ছেদ); চ. স্ক্লেরেন্‌কাইমা তন্তু (দীর্ঘচ্ছেদ); ছ. ও জ. প্রস্তর-কোষ।

জায়গায় গর্ত থাকে। এই গর্তগুলিকে সাধারণ কূপ বলে। কোলেন্‌কাইমা কলায়ও আন্তঃকোষীয় রন্ধ্র থাকে। এই কলার কোষের সাইটোপ্লাজ্‌মে ক্লোরোপ্লাস্‌ট এবং অনেক ভ্যাকুওল থাকে।

সাধারণতঃ কাণ্ড, পত্রের বৃন্ত এবং পত্রের মধ্যশিরায় কোলেন্‌কাইমা কলা দেখা যায়। কোষ-প্রাকার পুরু বলে, এই ধরনের কলা উদ্ভিদ-দেহকে ঋজু থাকতে কিছু পরিমাণে সাহায্য করে। সেইজন্য,

বায়ুপ্রবাহ ইত্যাদির ফলে কাণ্ড, পত্রের বৃন্ত ইত্যাদি বেঁকে গেলেও, আবার সহজে সোজা হতে পারে। ক্লোরোপ্লাস্ট থাকায়, এই কলা সালোকসংশ্লেষ-ও করতে পারে।

**স্ক্লেরেন্‌কাইমা (Sclerenchyma)** ঃ এই ধরনের কলার পরিণত কোষগুলি মৃত। স্ক্লেরেন্‌কাইমার কোষগুলি সচরাচর সরু, লম্বা (2 থেকে 500 মিলিমিটার পর্যন্ত) এবং ছুপ্রান্তে সুচালো। এদের কোষ-প্রাকারে লিগ্‌নিন (Lignin) নামের এক ধরনের পদার্থের স্তর জমা হয়ে কোষ-প্রাকার এত পুরু হয় যে, কোষের গহ্বর প্রায় থাকে না বললে চলে। খুব বেশি লম্বা স্ক্লেরেন্‌কাইমা কোষকে **স্ক্লেরেন্‌-কাইমা তন্তু** বলা হয়। পাট ও শণ গাছের আঁশ আসলে স্ক্লেরেন্‌-কাইমা তন্তু। পেয়ারা, নাশপাতি ইত্যাদির ফলত্বকে এক ধরনের স্ক্লেরেন্‌কাইমা কোষ পাওয়া যায়। এরা আকারে মোটামুটি গোল। এদের **স্ক্লেরাইড (Sclerides)** বা **প্রস্তর-কোষ** বলে। উদ্ভিদ-দেহের প্রায় সমস্ত শক্ত অংশে, বিশেষ করে কাষ্ঠল অংশে স্ক্লেরেন্‌কাইমা কলা থাকে। উদ্ভিদ-দেহকে দৃঢ় ও সোজা রাখা এই কলার কাজ।

উপরে যে তিন ধরনের কলার কথা বলা হল, তাদের নাম **সরল স্থায়ী কলা**। কারণ, এই ধরনের কোনও কলার সব কোষগুলি একই রকম। **জটিল স্থায়ী** কলা নামের আর এক ধরনের কলা আছে। এই ধরনের কলার কোষগুলি কয়েক রকমের হতে পারে। জটিল কলা আবার ছুরকম। যেমন— জাইলেম (Xylem ) ও ফ্লোয়েম (Phloem)।

**জাইলেম (Xylem)** ঃ এই জটিল কলার মূল উপাদান (1) **ট্রাকীড (Tracheid)** এবং (2) **ট্রাকীয়া (Trachaea)** বা **বাহিকা** নামের বিশিষ্ট কোষ। ট্রাকীড মৃত কোষ। এরা লম্বা এবং ছুপ্রান্তে সরু। জাইলেম কলায় ট্রাকীড কোষগুলি একটির উপর একটি পর পর সাজানো থাকে। এদের প্রাকার খুব পুরু, তবে প্রাকারে জায়গায় জায়গায় কূপ দেখা যায়। প্রধানতঃ ফার্ণ-জাতীয় উদ্ভিদ এবং ব্যক্তবীজী উদ্ভিদের জাইলেম কলায় ট্রাকীড পাওয়া যায়।

গুপ্তবীজী উদ্ভিদের জাইলেম কলায় ট্রাকীয়া পাওয়া যায়। ট্রাকীয়া-ও ট্রাকীডের মতো পুরু প্রাকার-যুক্ত, লম্বাটে মৃত কোষ। এরাও পর পর লম্বভাবে সাজানো থাকে, তবে এদের প্রস্থ-প্রাকার দ্রবীভূত হয়ে যাওয়ার ফলে একটি লম্বা, ফাঁপা নলের মতো অংশ তৈরী হয়। ট্রাকীডগুলির প্রস্থ-প্রাকার, অবশ্য, দ্রবীভূত হয় না। ট্রাকীড ও ট্রাকীয়া ছাড়া জাইলেম কলায় কিছু কিছু প্যারেন্‌কাইমা ও স্ক্লেরেন্‌কাইমা কোষ থাকে। এই দুধরনের কোষকে যথাক্রমে (3) **জাইলেম প্যারেন্‌কাইমা** বা **কাষ্ঠল প্যারেন্‌কাইমা** এবং (4) **জাইলেম তন্তু** বা **কাষ্ঠল তন্তু** বলে।

মূল যে জল শোষণ করে, তাকে পত্রে পরিবাহিত করা জাইলেম কলার প্রধান কাজ। ট্রাকীড ও ট্রাকীয়ার মধ্য দিয়েই এই জল পরিবাহিত হয়। জাইলেম প্যারেন্‌কাইমা জল পরিবহণে কিছু পরিমাণে সাহায্য করে। পুরু প্রাকার-যুক্ত জাইলেম তন্তু, ট্রাকীড এবং ট্রাকীয়া উদ্ভিদ-দেহকে দৃঢ় করে।

**ফ্লোয়েম (Phloem)ঃ** জাইলেমের মতো, ফ্লোয়েম কলায়-ও চার ধরনের কোষ দেখা যায়। (1) **সীভ নল** (Sieve tube) নামের এক ধরনের বেলনাকার সজীব কোষ-ই ফ্লোয়েমের প্রধান উপাদান। এই কোষগুলি একটির উপর আর একটি পর পর সাজানো থাকে। এদের নিউক্লিয়াস থাকে না। সীভ নলের প্রস্থ-প্রাকারে অনেক ছোট ছোট ছিদ্র থাকে। ফলে, প্রস্থ-প্রাকারটিকে চালনির মতো দেখায় বলে, এর নাম **চালনীচ্ছদা** বা **সীভ প্লেট** (Sieve plate)। পত্রে উৎপন্ন খাদ্যের দ্রবণ সীভ নলের মধ্য দিয়ে উদ্ভিদ-দেহের বিভিন্ন অংশে পরিবাহিত হয়। সীভ নলের পাশে পাতলা প্রাকার-যুক্ত আর এক ধরনের লম্বাটে কোষ দেখা যায়। এদের নাম (2) **সঙ্গী কোষ**। এদের সাইটোপ্লাজম খুব ঘন, নিউক্লিয়াস বেশ বড়। খাদ্য-পরিবহণে সীভ নলকে সাহায্য করা এদের কাজ। জাইলেমের মতো, ফ্লোয়েমেও প্যারেন্‌কাইমা এবং স্ক্লেরেন্‌কাইমা কোষ থাকে। ফ্লোয়েমের প্যারেন্‌কাইমা কোষের নাম (3) **ফ্লোয়েম প্যারেন্‌কাইমা**। খাদ্য সঞ্চয়

করে রাখা এবং খাদ্য-পরিবহণে সাহায্য করা এদের কাজ। ফ্লোয়েমের স্ক্লেরেন্‌কাইমা কোষকে (4) **ফ্লোয়েম তন্তু** বা **বাস্‌ট (Bast) তন্তু** বলে। এদের কাজ সাধারণ স্ক্লেরেন্‌কাইমা তন্তুর মতো।




4 নং চিত্র— ফ্লোয়েমের গঠন: ক. ফ্লোয়েমের দীর্ঘচ্ছেদ; খ. সীভ প্লেট ও সঙ্গী কোষের প্রস্থচ্ছেদ।

জাইলেম জল এবং খনিজ লবণের দ্রবণ (অর্থাৎ, খাদ্যের রসদ), এবং ফ্লোয়েম খাদ্য-পরিবহণ করে বলে, জাইলেম ও ফ্লোয়েম কলাকে একসঙ্গে **সংবহন-কলা** বলা হয়।

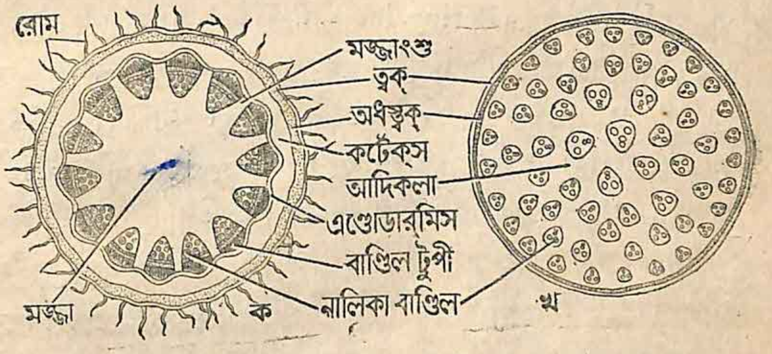
**কলাতন্ত্র ঃ** উদ্ভিদের কয়েক ধরনের কলা অনেক সময় দলবদ্ধভাবে এক ধরনের কাজ করে। এইরকম কলাগুলিকে একসঙ্গে একটি **কলাতন্ত্র** বলা হয়। কখনও কখনও মাত্র এক ধরনের কলা-ই একটি কলাতন্ত্র তৈরি করে। উদ্ভিদে তিন রকম কলাতন্ত্র দেখা যায়। যেমন—(1) **ত্বক্‌-কলাতন্ত্র**, (2) **আদি-কলাতন্ত্র** এবং (3) **সংবহন-কলাতন্ত্র**।

**কাণ্ড, মূল ও পত্রের গঠন ঃ** উপরে উদ্ভিদের বিভিন্ন কলা ও কলাতন্ত্রের বিষয়ে বলা হয়েছে। উদ্ভিদের বিভিন্ন অংশে অর্থাৎ কাণ্ড, মূল ও পত্রে এইসব কলাতন্ত্র ও কলা কিভাবে দেখতে পাওয়া যায়, সেবিষয়ে নিচের অনুচ্ছেদগুলিতে আলোচনা করা হল।

কাণ্ড, মূল, পত্র ইত্যাদির কলার গঠন ও বিন্যাস-ব্যবস্থা জানতে হলে, এদের সূক্ষ্ম ছেদ, বিশেষ করে, প্রস্থচ্ছেদ অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা করতে হয়। কাণ্ড ও মূল বেলনাকার। এদের কচি অংশের লম্বা অক্ষের সঙ্গে সমকোণে ছেদ কাটলে, প্রস্থচ্ছেদ পাওয়া যায়। কাণ্ড ও মূলের প্রস্থচ্ছেদ দেখতে বৃত্তের মতো। পত্র পাতলা পাতের মতো। পত্রের সমকোণে ছেদ করলে, পত্রের প্রস্থচ্ছেদ পাওয়া যায়। এই প্রস্থচ্ছেদ দেখতে আয়তাকার।

**কাণ্ডের গঠন ঃ** সব কাণ্ডের গঠন মোটামুটি একই ধরনের ; তবে, দ্বিবীজপত্রী ও একবীজপত্রী কাণ্ডের গঠনে কিছু কিছু পার্থক্য দেখা যায়। সেইজন্য, নিচে এই দুধরনের কাণ্ডের বর্ণনা দেওয়া হল। দ্বিবীজপত্রী কাণ্ড হিসাবে সূর্যমুখীর কাণ্ড এবং একবীজপত্রী কাণ্ড হিসাবে ভুট্টার কাণ্ডের বিষয়ে বলা হল।

**ত্বক্ ঃ** এই দুধরনের কাণ্ডের সব থেকে বাইরের (অর্থাৎ পরিধির) দিকে এক সারি আয়তাকার কোষ নিয়ে **ত্বক্** গঠিত। এই কোষগুলির প্রাকারের পরিধির দিকের তলে **কিউটিকল** (Cuticle)




5 নং চিত্র— কাণ্ডের গঠন ঃ ক. সূর্যমুখী এবং খ. ভুট্টা কাণ্ডের প্রস্থচ্ছেদ (চিত্ররূপ)।

নামের এক ধরনের শক্ত পদার্থের আবরণ থাকে। এই কলায় আন্তঃ-কোষীয় রন্ধ্র থাকে না। সূর্যমুখীর ত্বকে **বহুকোষী রোম** থাকে। ভুট্টার ত্বকে রোম থাকে না। কেবল ত্বক্ নিয়েই কাণ্ডের ত্বক্-কলাতন্ত্র গঠিত হয়। বাইরের আঘাত, উষ্ণতার তারতম্য, জীবাণু ইত্যাদির থেকে রক্ষা করা ত্বকের প্রধান কাজ।

**অধস্ত্বক্ ঃ** সূর্যমুখী কাণ্ডের ত্বকের ঠিক ভিতরের দিকে চার-পাঁচ স্তর কোলেন্‌কাইমা কোষ থাকে। এর নাম **অধস্ত্বক্**। ভুট্টার অধস্ত্বক্ তিন-চার স্তর স্ক্লেরেন্‌কাইমা কোষ দিয়ে গঠিত।

**সাধারণ কর্টেক্স** (General cortex) ঃ সূর্যমুখী কাণ্ডের অধস্ত্বকের ভিতরের দিকে কয়েক স্তর প্যারেন্‌কাইমা কোষ থাকে।

এর নাম **সাধারণ বহিঃস্তর** বা **সাধারণ কর্টেক্স**। এর মধ্যে রজন নালী দেখা যায়।

**এণ্ডোডারমিস** (Endodermis) : সূর্যমুখী কাণ্ডের সাধারণ কর্টেক্সের ভিতরের দিকে পিপার মতো দেখতে এক সারি কোষ থাকে। এর নাম **অন্তস্ত্বক্** বা **এণ্ডোডারমিস** (Endodermis)। এই কোষগুলিতে প্রচুর পরিমাণে শ্বেতসার দানা জমা থাকে। তাই, এর আর এক নাম **শ্বেতসার স্তর**।

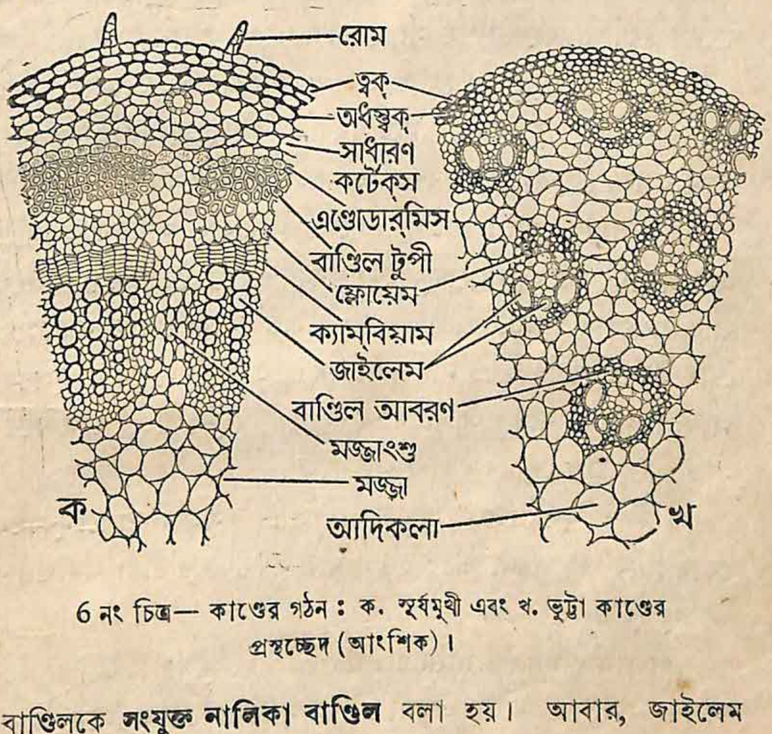
**পেরিসাইক্ল** (Pericycle) : সূর্যমুখী কাণ্ডের এণ্ডোডার্মিসের ভিতরের দিকে কয়েক স্তর কোষ নিয়ে যে অঞ্চল, তার নাম **পরিচক্র** বা **পেরিসাইক্ল** (Pericycle)। নালিকা বাণ্ডিল(পরে দ্রষ্টব্য)-এর মাথার কাছে পেরিসাইক্লের অংশ স্ক্লেরেন্কাইমা কলা দিয়ে গঠিত। এর নাম **বাণ্ডিল টুপী** বা **কঠিন শকল**। নালিকা বাণ্ডিল-গুলির অন্তর্বর্তী অঞ্চলে পেরিসাইক্ল প্যারেন্কাইমা দিয়ে গঠিত। অতএব, কঠিন শকল ও প্যারেন্কাইমা নিয়ে পেরিসাইক্ল তৈরী।

**মজ্জা ও মজ্জাংশু** : সূর্যমুখী কাণ্ডের কেন্দ্রে যে প্যারেন্কাইমা কলা থাকে, তার নাম **মজ্জা**। নালিকা বাণ্ডিলগুলির দুপাশে যে আয়তাকার প্যারেন্কাইমা কোষের কলা থাকে, তাকে **মজ্জাংশু** বলে।

অধস্ত্বক্, সাধারণ কর্টেক্স এবং এণ্ডোডার্মিসকে একসঙ্গে **কর্টেক্স** (Cortex) বা **বহিঃস্তর** বলে। কর্টেক্স, পেরিসাইক্ল এবং মজ্জা ও মজ্জাংশু নিয়ে সূর্যমুখী কাণ্ডের আদিকলাতন্ত্র তৈরী হয়। ভুট্টার কাণ্ডে সাধারণ কর্টেক্স, পেরিসাইক্ল, মজ্জা ও মজ্জাংশু থাকে না। অধস্ত্বকের ভিতরের দিকে **আদিকলা** নামের এক ধরনের প্যারেন্কাইমা কলা থাকে। অতএব, অধস্ত্বক্ ও আদিকলা নিয়ে ভুট্টা কাণ্ডের আদিকলাতন্ত্র তৈরী হয়।

কাণ্ডের আদিকলাতন্ত্রের বিভিন্ন কলা প্রধানতঃ খাদ্য ও জল সঞ্চয় করে রাখে। কোলেন্কাইমা ও স্ক্লেরেন্কাইমা কোষগুলি উদ্ভিদ-দেহকে ঋজু থাকতে সাহায্য করে। নালিকা বাণ্ডিলগুলিকে ধারণ করা-ও আদিকলাতন্ত্রের কাজ।

**নালিকা বাণ্ডিল :** সূর্যমুখী কাণ্ডের পেরিসাইক্লের ভিতরের দিকে একসারি গোল গোল কলাসমষ্টি দেখা যায়। এদের নাম **নালিকা বাণ্ডিল**। নালিকা বাণ্ডিলের বাইরের (অর্থাৎ পরিধির) দিকে থাকে ফ্লোয়েম কলা, আর ভিতরের (অর্থাৎ কেন্দ্রের) দিকে থাকে জাইলেম কলা। ফ্লোয়েম ও জাইলেমের মাঝে **ক্যাম্বিয়াম** (Cambium) নামের এক ধরনের ভাজক কলা থাকে। নালিকা বাণ্ডিলগুলি একটি বৃত্তের পরিধি-বরাবর সাজানো থাকে। এইরকম বিন্যাস-ব্যবস্থাকে **বলয় সমাবেশ** বলা হয়। জাইলেম এবং ফ্লোয়েম বৃত্তের একই ব্যাসার্ধ-বরাবর থাকে বলে, এই ধরনের নালিকা




6 নং চিত্র— কাণ্ডের গঠন : ক. সূর্যমুখী এবং খ. ভুট্টা কাণ্ডের প্রস্থচ্ছেদ (আংশিক)।

বাণ্ডিলকে **সংযুক্ত নালিকা বাণ্ডিল** বলা হয়। আবার, জাইলেম কলার কেবল এক পাশে (বাইরের দিকে) ফ্লোয়েম থাকে। সেইজন্য, এই নালিকা বাণ্ডিলের নাম **সমপার্শ্বীয় নালিকা বাণ্ডিল**। জাইলেম ও ফ্লোয়েমের মাঝে ক্যাম্বিয়াম (ভাজক কলা) থাকে বলে, এই

নালিকা বাণ্ডিলের নাম **মুক্ত নালিকা বাণ্ডিল**। অতএব, সূর্যমুখীর নালিকা বাণ্ডিল সংযুক্ত, সমপার্শ্বীয় ও মুক্ত।

ভুট্টা কাণ্ডের নালিকা বাণ্ডিলগুলি আদিকলায় বিক্ষিপ্তভাবে থাকে। নালিকা বাণ্ডিলের এইরকম বিন্যাস-ব্যবস্থার নাম **বিক্ষিপ্ত সমাবেশ**। পরিধির দিকের নালিকা বাণ্ডিলগুলি ছোট এবং সংখ্যায় বেশি, কেন্দ্রের দিকের গুলি বড় এবং সংখ্যায় অনেক কম। এই নালিকা বাণ্ডিলও সংযুক্ত ও সমপার্শ্বীয়। তবে, ক্যাম্বিয়াম না থাকায়, এদের **বদ্ধ নালিকা বাণ্ডিল** বলা হয়। ভুট্টার নালিকা বাণ্ডিলের চারদিকে স্ক্লেরেন্‌কাইমা কলার একটি আবরণ থাকে। এর নাম **বাণ্ডিল আবরণ**।

নালিকা বাণ্ডিলগুলি নিয়ে **সংবহন-কলাতন্ত্র** গঠিত হয়। জল ও খাদ্যের দ্রবণ পরিবহণ করাই সংবহন-কলাতন্ত্রের প্রধান কাজ।

***মূলের গঠন ঃ*** একবীজপত্রী ও দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদের মূলের গঠনে পার্থক্য খুব কম। নিচে দ্বিবীজপত্রী (ছোলার) মূল এবং একবীজপত্রী (কচুর) মূলের বর্ণনা একসঙ্গে দেওয়া হল।

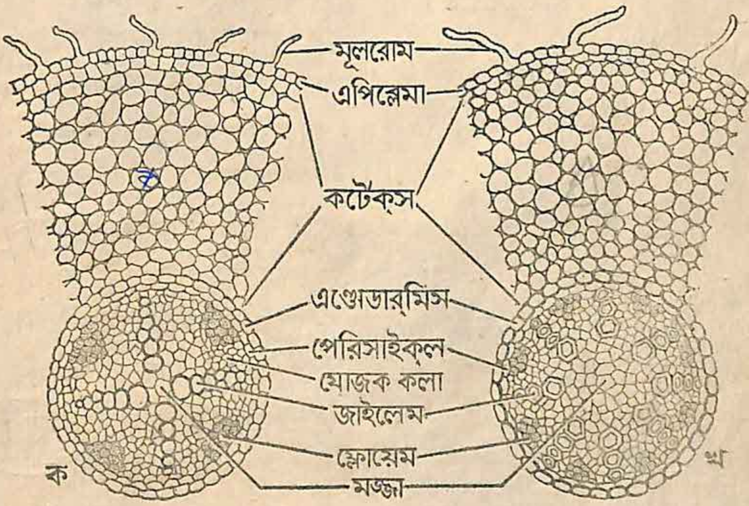
**এপিব্লেমা** (Epiblema) ঃ মূলের পরিধিতে অবস্থিত একসারি আয়তাকার সজীব প্যারেন্‌কাইমা কোষ দিয়ে তৈরী হয় **মূলত্বক্‌** বা **এপিব্লেমা** (Epiblema)। এপিব্লেমার কোষ থেকে এককোষী রোম উৎপন্ন হয়। এদের নাম **মূলরোম**। এপিব্লেমায় কিউটিক্‌ল-এর আবরণ থাকে না। এপিব্লেমা-ই মূলের ত্বক্‌-কলাতন্ত্র গঠন করে। মাটি থেকে জল শোষণ করা-ই এর কাজ।

**কর্টেক্স** (Cortex) ঃ কয়েক সারি সজীব প্যারেন্‌কাইমা কোষ নিয়ে এই অঞ্চল গঠিত হয়। খাদ্য সঞ্চয় করে রাখা **বহিঃস্তর** বা **কর্টেক্স**(Cortex)-এর কাজ।

**এণ্ডোডার্মিস** (Endodermis) ঃ কর্টেক্সের ভিতরের দিকে অবস্থিত পিপার মতো একসারি ঘন-সন্নিবিষ্ট কোষ নিয়ে **এণ্ডোডার্মিস** (Endodermis) বা **অন্তস্ত্বক্‌** গঠিত। কর্টেক্স থেকে এণ্ডোডার্মিসের ভিতরের দিকে অবস্থিত কোষগুলিতে জল পরিবহণ করা এণ্ডোডার্মিসের কাজ।

**পেরিসাইক্ল (Pericycle) :** এণ্ডোডারমিসের ভিতরের দিকে অবস্থিত একসারি প্যারেন্‌কাইমা কোষ দিয়ে পেরিসাইক্ল (Pericycle) বা পরিচক্র তৈরী হয়। এই অঞ্চল থেকে মূলের শাখা-প্রশাখা উৎপন্ন হয়।

**যোজক কলা :** জাইলেম ও ফ্লোয়েম কলার অন্তর্বর্তী অঞ্চলে ঘন-সন্নিবিষ্ট প্যারেন্‌কাইমা কোষ দিয়ে **যোজক কলা** তৈরী হয়।



7 নং চিত্র— মূলের গঠন : ক. ছোলা এবং খ. কচু মূলের প্রস্থচ্ছেদ (আংশিক)।

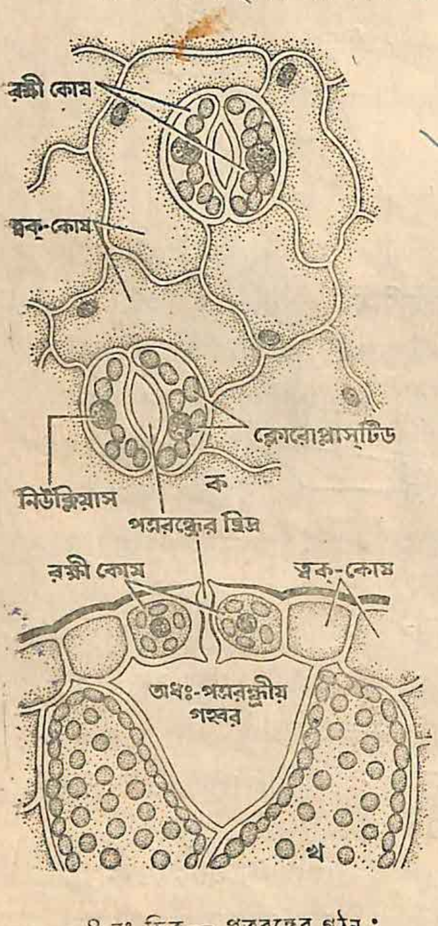
**মজ্জা :** মূলের কেন্দ্রে অবস্থিত ঘন-সন্নিবিষ্ট প্যারেন্‌কাইমা কোষ দিয়ে তৈরী কলাকে **মজ্জা** বলে। ছোলা মূলের মজ্জা খুবই ছোট। কচু মূলের মজ্জা অনেকখানি জায়গা জুড়ে থাকে।

কর্টেক্স, এণ্ডোডারমিস, পেরিসাইক্ল, যোজক কলা এবং মজ্জা নিয়ে মূলের আদিকলাতন্ত্র গঠিত হয়।

**নালিকা বাণ্ডিল :** মূলের নালিকা বাণ্ডিল কাণ্ডের মতো নয়। জাইলেম এবং ফ্লোয়েম বৃত্তের পৃথক পৃথক ব্যাসার্ধ-বরাবর বিন্যস্ত থাকে অর্থাৎ বৃত্তের পরিধি-বরাবর জাইলেম, তার পাশে ফ্লোয়েম, তার পাশে জাইলেম— এইভাবে, অর্থাৎ একান্তরভাবে সাজানো থাকে। সেইজন্য,

এইরকম নালিকা বাণ্ডিলকে **অরীয় নালিকা বাণ্ডিল** বলা হয়। দ্বিবীজপত্রী মূলে সাধারণতঃ চার-পাঁচটি করে (ছোলা মূলের চারটি করে) জাইলেম ও ফ্লোয়েম থাকে। একবীজপত্রী মূলে ছটি কিংবা তার বেশি সংখ্যায় (কচু মূলে আটটি) জাইলেম ও ফ্লোয়েম থাকে। এছাড়া, দ্বিবীজপত্রী মূলের ফ্লোয়েমে ফ্লোয়েম তন্তু থাকে। কিন্তু, একবীজপত্রী মূলে ফ্লোয়েম তন্তু থাকে না।

কাণ্ডের মতো মূলের নালিকা বাণ্ডিলগুলিই সংবহন-কলাতন্ত্র গঠন করে। এই কলাতন্ত্রের কাজ কাণ্ডেরই মতো।



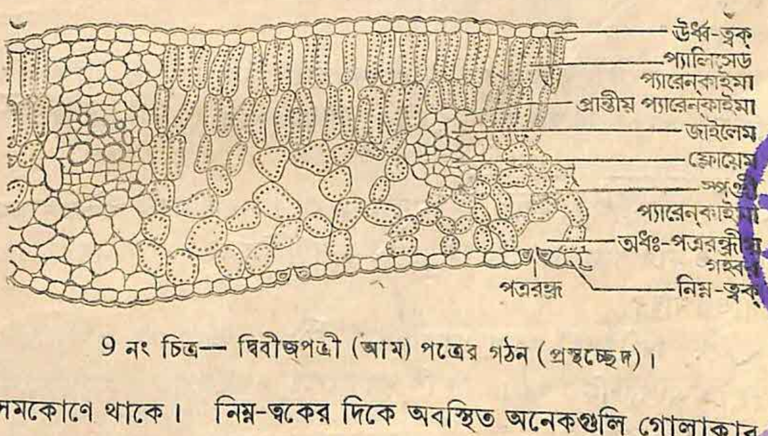

৪ নং চিত্র— পত্ররন্ধ্রের গঠন :
ক. পৃষ্ঠদৃশ্য ; খ. প্রস্থচ্ছেদ।

*পত্রের গঠন* **:** দ্বিবীজপত্রী ও একবীজপত্রী উদ্ভিদের পত্রের গঠনে সামান্য পার্থক্য দেখা যায়। যেমন— আম ইত্যাদির পত্রে উপরের এবং নিচের তলের তফাত সহজে ধরা যায়। কিন্তু, খেজুর প্রভৃতি একবীজপত্রী পত্রের দুটি তল এইভাবে আলাদা করা যায় না। যাই হোক, নিচে দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদের পত্র হিসাবে আম-পাতার গঠনের বর্ণনা দেওয়া হল।

ত্বক্ : পত্রের দুটি ত্বক্। উপরের তলের ত্বকের নাম **ঊর্ধ্ব-ত্বক্**, নিচের তলের ত্বকের নাম **নিম্ন-ত্বক্**। দুটি ত্বক্ই একসারি করে প্যারেন্‌কাইমা কোষ দিয়ে গঠিত। **ঊর্ধ্ব**-ত্বকের কোষগুলির প্রকারের

বাইরের দিকের তলে কিউটিক্ল-এর আবরণ থাকে। নিম্ন-ত্বকে কিউটিক্ল-এর আবরণ পাতলা। নিম্ন-ত্বকে অসংখ্য ছোট ছোট ছিদ্র থাকে। এদের নাম **পত্ররন্ধ্র**। পত্ররন্ধ্রের দুপাশে দুটি **রক্ষী কোষ** থাকে। রক্ষী কোষে প্রচুর পরিমাণে ক্লোরোপ্লাস্টিড থাকে। পত্ররন্ধ্রের ভিতরের দিকে থাকে একটি বায়ুপূর্ণ গহ্বর। এর নাম **শ্বাস-গহ্বর, বাতাবকাশ** বা **অধঃ-পত্ররন্ধ্রীয় গহ্বর**। শ্বসন ও সালোক-সংশ্লেষের সময় অক্সিজেন ও কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাসের আদান-প্রদান এবং বাষ্পমোচনের সময় জলীয় বাষ্প ত্যাগ করা পত্ররন্ধ্রের কাজ। দুটি ত্বক্ নিয়ে পত্রের ত্বক্-কলাতন্ত্র গঠিত।

**মেসোফিল** (Mesophyll) : দুটি ত্বকের মধ্যবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত প্যারেন্‌কাইমা কলা দিয়ে গঠিত অংশকে **মেসোফিল** (Mesophyll) বলে। মেসোফিলকে দুভাগে ভাগ করা যায়। ঊর্ধ্ব-ত্বকের দিকে অবস্থিত দু-তিন সারি পিপার মতো ঘন-সন্নিবিষ্ট কোষ দিয়ে গঠিত হয় **প্যালিসেড প্যারেন্‌কাইমা** (Palisade parenchyma) অঞ্চল। এই কোষগুলির লম্বা অক্ষ ঊর্ধ্ব-ত্বকের সঙ্গে




9 নং চিত্র— দ্বিবীজপত্রী (আম) পত্রের গঠন (প্রস্থচ্ছেদ)।

সমকোণে থাকে। নিম্ন-ত্বকের দিকে অবস্থিত অনেকগুলি গোলাকার অথবা ডিম্বাকার প্যারেন্‌কাইমা কোষ দিয়ে গঠিত হয় **স্পঞ্জী প্যারেন্‌কাইমা** (Spongy parenchyma) অঞ্চল। এই কলায় প্রচুর আন্তঃকোষীয় রন্ধ্র থাকে।

মেসোফিল কলার প্রতিটি কোষে প্রচুর পরিমাণে ক্লোরোপ্লাস্টিড থাকে। সেইজন্য, এই কলায় সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় খাদ্য প্রস্তুত হয়। এছাড়া, শ্বাসন ও বাষ্পমোচন করা-ও মেসোফিল কলার কাজ। মেসোফিল-ই পত্রের আদিকলাতন্ত্র।

**নালিকা বাণ্ডিল ঃ** পত্রের শিরা-উপশিরাগুলিই নালিকা বাণ্ডিল। এরা মেসোফিল কলায় বিন্যস্ত থাকে। নালিকা বাণ্ডিলগুলি সংযুক্ত, সমপার্শ্বীয় ও বদ্ধ শ্রেণীর। এদের জাইলেম উপরের তলের দিকে এবং ফ্লোয়েম নিচের তলের দিকে থাকে। একসারি ক্লোরোপ্লাস্ট-বিহীন বড় বড় কোষ দিয়ে নালিকা বাণ্ডিলগুলি আবৃত থাকে। এর নাম প্রান্তীয় প্যারেনকাইমা। বলা বাহুল্য, নালিকা বাণ্ডিলগুলি পত্রের সংবহন-কলাতন্ত্র গঠন করে। এদের কাজ কাণ্ড ও মূলের মতো।

## অনুশীলনী

1. কলা বলতে কি বোঝায়? তিনটি বিভিন্ন ধরনের উদ্ভিদ-কলার নাম লেখ। এদের কোনটির কি কাজ, তা বল।

2. ভাজক কলা কাকে বলে? কি কি লক্ষণ দেখে ভাজক কলা চেনা যায়? এই কলা উদ্ভিদ-দেহের কোথায় কোথায় পাওয়া যায়? এই কলার কাজ কি?

3. যে কোনও একটি সরল স্থায়ী কলার ছবি আঁক এবং এর বিভিন্ন অংশ চিহ্নিত কর। এই কলার কাজ কি? উদ্ভিদ-দেহের কোথায় কোথায় এই কলা পাওয়া যায়, তা লেখ।

4. জটিল কলা বলতে কি বোঝায়? যে কোনও একটি জটিল কলার গঠন ও কাজ সংক্ষেপে বর্ণনা কর। এই কলা উদ্ভিদ-দেহের কোথায় কোথায় পাওয়া যায়?

5. দ্বিবীজপত্রী অথবা একবীজপত্রী কাণ্ডের প্রস্থচ্ছেদের ছবি এঁকে, বিভিন্ন অংশ চিহ্নিত কর। কি কি লক্ষণ দেখে একবীজপত্রী এবং দ্বিবীজপত্রী কাণ্ডের প্রস্থচ্ছেদ চিনবে?

6. দ্বিবীজপত্রী অথবা একবীজপত্রী মূলের প্রস্থচ্ছেদের ছবি এঁকে, বিভিন্ন অংশ চিহ্নিত কর। একবীজপত্রী অথবা দ্বিবীজপত্রী মূলের প্রস্থচ্ছেদ, কোন কোন লক্ষণ দেখে ঠিক করবে?

7. দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদের পত্রের প্রস্থচ্ছেদ এঁকে, বিভিন্ন অংশ চিহ্নিত কর।

8. নিচের বক্তব্যগুলির যেটি ঠিক, তার পাশে 'হ্যাঁ' এবং যেটি ভুল, তার পাশে 'না' লেখ :—

(ক) ভাজক কলা মৃত কোষ দিয়ে তৈরী ; (খ) প্যারেন্‌কাইমা কলার কোষ-বিভাজনের ফলে দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদের কাণ্ড ও মূল মোটা হতে পারে ; (গ) কোলেন্‌কাইমা কলার কোষগুলির প্রাকারে পেক্‌টিন থাকে ; (ঘ) পেয়ারার ফলত্বকে প্রস্তর-কোষ থাকে ; (ঙ) জাইলেম এক ধরনের জটিল স্থায়ী কলা ; (চ) ফ্লোয়েম জল এবং খনিজ লবণের দ্রবণ পরিবহণ করে ; (ছ) দ্বিবীজপত্রী কাণ্ডের নালিকা বাণ্ডিলে ক্যাম্‌বিয়াম থাকে না ; (জ) একবীজপত্রী কাণ্ডে এণ্ডোডার্‌মিস থাকে না ; (ঝ) একবীজপত্রী মূলের চেয়ে দ্বিবীজপত্রী মূলের নালিকা বাণ্ডিলের সংখ্যা বেশি ; (ঞ) পত্রে দুটি ত্বক্‌ থাকে।

9. শূন্যস্থান পূরণ কর :—

(ক) কোলেন্‌কাইমা এক ধরনের সরল — কলা ; (খ) বাহিকা থাকে — কলায় ; (গ) সীভ নলে — থাকে না ; (ঙ) — এবং — এই দুই ধরনের কলাকে একসঙ্গে সংবহন-কলা বলা হয় ; (ঙ) আদিকলা পাওয়া যায় — উদ্ভিদের কাণ্ডে।

---

# প্রাণিকলা ও অঙ্গ | 3

উদ্ভিদের মতো, বহুকোষী প্রাণীদের দেহে-ও নানারকমের কলা দেখা যায়। এই পরিচ্ছেদে প্রাণীদের বিভিন্ন রকম কলার প্রাথমিক বিবরণ দেওয়া হল।

**প্রাণিকলার প্রকারভেদ :** উচ্চতর বহুকোষী প্রাণীদের দেহে, বিশেষ করে মেরুদণ্ডী প্রাণীদের দেহে চার রকমের প্রধান কলা দেখা যায়। যেমন— (1) আবরণী কলা, (2) যোগ-কলা, (3) পেশী-কলা এবং (4) নার্ভ-কলা। নিচে এদের গঠন, প্রাপ্তিস্থান, কাজ ইত্যাদি সম্বন্ধে আলোচনা করা হল।

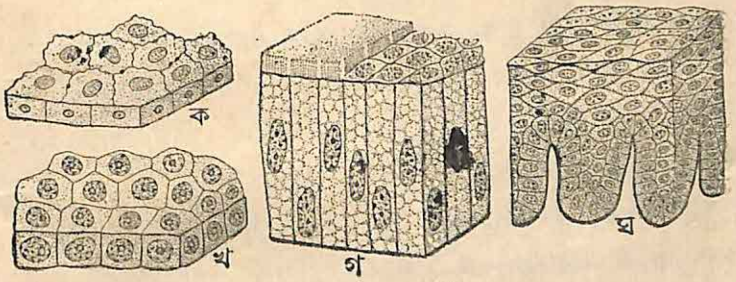
***আবরণী কলা :*** এই কলা দেহের বাইরের দিকের সব অঙ্গের বাইরের আবরণ তৈরি করে। দেহের ভিতরে যেসব গহ্বর আছে, তাদের ভিতরের তলের আবরণ-ও এই কলা দিয়ে তৈরী। আবৃত করে বলে, এদের নাম **আবরণী কলা**।

আবরণী কলার কোষগুলি খুব সূক্ষ্ম একটি পর্দার উপরে একটি অথবা কয়েকটি স্তরে সাজানো থাকে। এই পর্দার নাম **ভিত্তিপর্দা**।

রক্ষণ-ই আবরণী কলার মূল কাজ ; অর্থাৎ, এরা দেহের বাইরের দিকের অঙ্গকে ঘর্ষণ ইত্যাদি আঘাত থেকে রক্ষা করে। ক্ষরণ-ও আবরণী কলার কাজ। নাক ও গলার আবরণী কলা থেকে শ্লেষ্মা নিঃসৃত হয়। সেইজন্য, এই আবরণী কলাকে **শ্লেষ্মঝিল্লী** বলা হয়। পাকস্থলী ও অন্ত্রের আবরণী কলা থেকে পাচক রস ক্ষরিত হয়। অনেক সময় রস-নিঃসরণকারী আবরণী কলার কোষগুলি গুচ্ছাকারে বিন্যস্ত হয়ে, গ্রন্থি তৈরি করে। স্বেদ-গ্রন্থি, তৈল-গ্রন্থি, লালা-গ্রন্থি ইত্যাদি গ্রন্থি থেকে যথাক্রমে ঘাম, একরকম তৈলাক্ত পদার্থ এবং লালা নিঃসৃত হয়। শ্বাসনালিকার আবরণী কলায় সূক্ষ্ম চুলের মতো **সিলিয়া** (Cilia) থাকে। সিলিয়ার আন্দোলনে রোগ-জীবাণু দেহের

বাইরের দিকে চলে আসে। জিহ্বার আবরণী কলা অনুভূতি গ্রহণ করতে পারে। বৃক্কের বৃক্ক-নালিকার যে কলা রেচন ও জল-শোষণ করে তা-ও আবরণী কলা। শুক্রাণু ও ডিম্বাণু গঠন করা-ও আবরণী কলার কাজ।

যে আবরণী কলার মাত্র এক স্তর কোষ থাকে, তাকে সরল আবরণী কলা বলে। কোষের আকার অনুসারে, সরল আবরণী কলা আবার তিন ধরনের। যেমন— (1) **স্কোয়ামাস এপিথিলিয়াম** (Squamous epithelium) (2) **কিউবয়ডাল এপিথিলিয়াম** (Cuboidal epithelium) এবং (3) **কলাম্নার এপিথিলিয়াম** (Columnar epithelium)। স্কোয়ামাস এপিথিলিয়ামের কোষগুলির দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের চেয়ে উচ্চতা অনেক কম, অর্থাৎ এই কোষগুলি খুব পাতলা। রক্তবাহের ভিতরের প্রাকারে এবং হৃৎপিণ্ড ও ফুসফুসের বাইরের তলে




10 নং চিত্র— আবরণী কলা : ক. স্কোয়ামাস আবরণী কলা; খ. কিউবয়ডাল আবরণী কলা; গ. কলাম্নার আবরণী কলা; ঘ. স্তরীভূত আবরণী কলা।

এই আবরণী কলা পাওয়া যায়। অগ্ন্যাশয় ও লালা-গ্রন্থির নালীতে এবং থাইরয়েড (Thyroid) নামের অনাল গ্রন্থিতে কিউবয়ডাল এপিথিলিয়াম দেখা যায়। এর কাজ রস নিঃসরণ করা। এই আবরণী কলার কোষগুলির দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা সমান। কলাম্নার এপিথি-

লিয়ামের কোষগুলির দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের চেয়ে উচ্চতা বেশি। পাকস্থলী ও অন্ত্রের ভিতরের আবরণ এই ধরনের আবরণী কলা দিয়ে তৈরী।

আর এক ধরনের আবরণী কলায় ভিত্তিপর্দার উপর কোষগুলি অনেকগুলি স্তরে সাজানো থাকে। ভিত্তিপর্দার সঙ্গে যুক্ত কোষগুলি কলাম্‌নার কোষ, এর পরের কোষগুলি কিউবয়ডাল ধরনের এবং সবচেয়ে বাইরের স্তরের কোষগুলি স্কোয়ামাস ধরনের। মেরুদণ্ডী প্রাণীদের চর্মের বাইরের আবরণ এবং মুখ-বিবরের ভিতরের আবরণ এইরকম আবরণী কলা দিয়ে গঠিত। এই আবরণী কলার কোষগুলি অনেকগুলি স্তরে বিন্যস্ত থাকে বলে, একে **স্তরীভূত আবরণী কলা** বলা হয়।

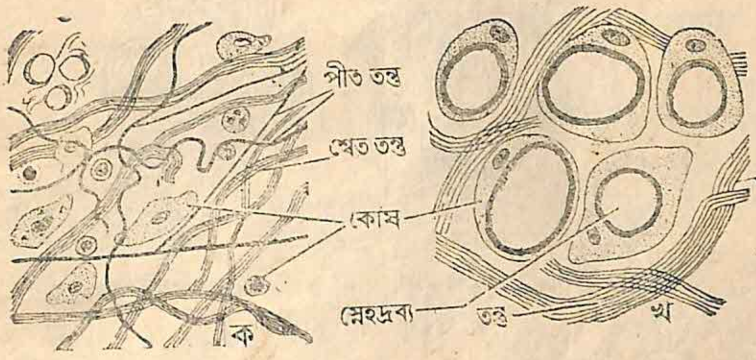
***যোগ-কলা*** **ঃ** দেহের সব অংশেই কোনও-না-কোনও যোগ-কলা দেখা যায়। এই কলায় কোষের পরিমাণ খুব অল্প। এই কোষগুলি একরকম পদার্থ ক্ষরণ করে। এর নাম **ধাত্র**। ধাত্র কঠিন, অর্ধ-তরল অথবা তরল হতে পারে। ধাত্রের মধ্যে কোষগুলি বিক্ষিপ্তভাবে থাকে। কোষ ছাড়া, ধাত্রে নানারকম কঠিন ও দ্রবীভূত পদার্থ থাকে।

বিভিন্ন কলা অথবা বিভিন্ন অঙ্গের মধ্যে যোগসাধন করা, এবং একটি কলার সঙ্গে অন্য কলাকে আট্‌কে রাখা যোগ-কলার প্রধান কাজ। এছাড়া, বিভিন্ন বিপাকীয় ক্রিয়ার ফলে যে নানারকম রাসায়নিক পদার্থ উদ্ভূত হয়, তাদের পরিবহণ করা, স্নেহদ্রব্য জমা করে রাখা, রোগ-জীবাণুর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা, ক্ষত-নিরাময়ে সাহায্য করা এবং ভর বহন করা যোগ-কলার অন্যান্য কাজ।

প্রধানতঃ ধাত্রের প্রকৃতি অনুসারে, যোগ-কলা নানারকমের হয়। নিচে প্রধান কয়েক রকমের যোগ-কলা সম্বন্ধে আলোচনা করা হল।

**তন্তুময় যোগ-কলা ঃ** এই যোগ-কলার কোষগুলি গোল গোল বা শাখা-প্রশাখাযুক্ত। এরা ধাত্রের মধ্যে যেখানে সেখানে ছড়ানো থাকে। ধাত্রে, কোষগুলির আশে-পাশে সূক্ষ্ম সুতার মতো অনেক তন্তু দেখা যায়। তন্তু আবার দুরকম। কতকগুলি তন্তু সাদা। এরা পরস্পর সমান্তরালভাবে ঢেউ খেলানো গুচ্ছের মতো সাজানো

থাকে। এদের শাখা থাকে না। এরা স্থিতিস্থাপক নয়। এদের নাম **শ্বেত তন্তু**। অন্য ধরনের তন্তুগুলি মোটামুটি হাল্‌কা হলুদ রঙের। এরা আলাদাভাবে থাকে, স্থিতিস্থাপক এবং শাখাযুক্ত। এদের **পীত তন্তু** বা **স্থিতিস্থাপক তন্তু** বলে। **কণ্ডরা** (সাদা দড়ির মতো যে কলা পেশী-গুচ্ছকে অস্থির সঙ্গে আট্‌কে রাখে) এবং **সন্ধিবন্ধনী** (সাদা ফিতার



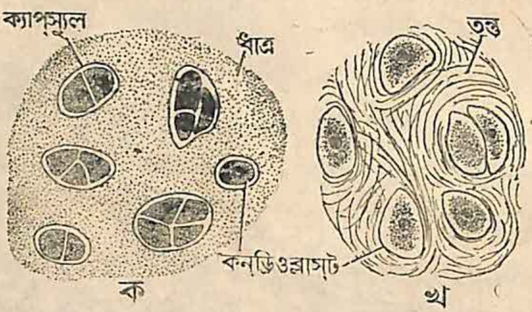

11 নং চিত্র— যোগ-কলা : ক. তন্তুময় যোগ-কলা ; খ. মেদকলা।

মতো যে কলা অস্থিখণ্ডগুলিকে পরস্পর জুড়ে রাখে) তন্তুময় যোগ-কলা দিয়ে তৈরী। তন্তুময় যোগ-কলা চর্মকে পেশীর সঙ্গে আট্‌কে রাখে। ধমনীর প্রাকারে এবং ফুস্‌ফুসেও এই কলা পাওয়া যায়।

**মেদকলা :** এই কলায় তন্তুময় যোগ-কলার মতো তন্তু থাকে। এর কোষগুলি গোল গোল অথবা বহুভুজাকার। কোষের বেশির ভাগ জায়গা জুড়ে স্নেহদ্রব্যের কণা জমা থাকে এবং সাইটোপ্লাজ্‌ম ও নিউক্লিয়াস কোষের পরিধির দিকে থাকে। মানুষের উদর ও তলপেটে, চর্মের গভীর স্তরে, অস্থি-মজ্জায় এবং বৃক্ক ও হৃৎপিণ্ডের উপরে প্রচুর পরিমাণে মেদকলা দেখা যায়।

**বিশিষ্ট যোগ-কলা :** কোমলাস্থি বা তরুণাস্থি, অস্থি এবং রক্ত— এই তিন ধরনের কলাকে বিশিষ্ট যোগ-কলা বলা হয়। নিচে এদের সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল।

**কোমলাস্থি :** এই যোগ-কলার ধাত্র ঈষদচ্ছ এবং শক্ত। এর নাম **কন্‌ড্রিন** (Chondrin)। ধাত্রের মধ্যে কতকগুলি কোষপূর্ণ গহ্বর দেখা যায়। এইগুলিকে **ক্যাপস্যুল** (Capsule) বলে। ক্যাপ্-স্যুলের মধ্যে সচরাচর দুটি অথবা চারটি কোষ থাকে। তবে, একটি



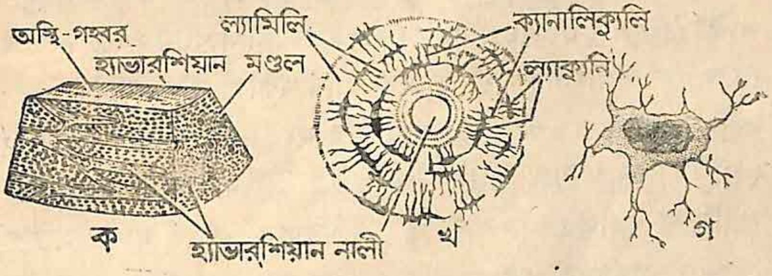

12 নং চিত্র— কোমলাস্থি : ক. কাচিক কোমলাস্থি ; খ. তন্তুময় কোমলাস্থি।

এবং তিনটি কোষও দেখা যায়। এই কোষগুলির নাম **কোমলাস্থি-কোষ** বা **কন্‌ড্রিওব্লাস্ট** (Chondrioblast)। **পেরিকন্‌ড্রিয়াম** (Perichondrium) নামের একরকম তন্তুময় যোগ-কলার আবরণ দিয়ে কোমলাস্থি বেষ্টিত থাকে।

নাক ও শ্লোমনালিকায় যে কোমলাস্থি পাওয়া যায়, তার ধাত্র সাদা, ঈষদচ্ছ এবং নমনীয়। এই কোমলাস্থির নাম **কাচিক কোমলাস্থি**। মানবশিশুর দুটি কশেরুকার মধ্যবর্তী স্থানে **তন্তুময় কোমলাস্থি** নামের আর এক ধরনের কোমলাস্থি পাওয়া যায়। এর ধাত্রে প্রচুর পরিমাণে শ্বেত তন্তু থাকে।

**অস্থি :** মেরুদণ্ডী প্রাণীদের দেহের কাঠামো তৈরী হয় দেহের ভিতরে অবস্থিত **কঙ্কাল** দিয়ে। কঙ্কাল অনেকগুলি ছোট-বড় হাড় দিয়ে তৈরী হয়। হাড়কে বিজ্ঞানের ভাষায় **অস্থি** বলে। এই বিশিষ্ট যোগ-কলার ধাত্র এক ধরনের জৈব পদার্থ। তবে, এতে প্রচুর পরিমাণে ক্যাল্‌শিয়াম ফস্‌ফেট (Calcium phosphate) এবং ক্যাল্‌শিয়াম কার্বোনেট (Calcium carbonate) জমা হওয়ায়, ধাত্র খুব শক্ত ও

ভঙ্গুর। অস্থির ধাত্র অনেকগুলি স্তরে বিভক্ত। এই স্তরগুলির নাম **ল্যামেলা** (Lamella)*। হাত ও পায়ের লম্বা, ফাঁপা অস্থিতে ল্যামেলাগুলি সমকেন্দ্রীয়ভাবে অর্থাৎ, এক-একটি সাধারণ কেন্দ্রের চারদিকে ছোট-বড় বৃত্তের আকারে সাজানো থাকে। এই কেন্দ্রে একটি নালী থাকে। এর নাম **হ্যাভার্‌শিয়ান (Haversian) নালী**। হ্যাভার্‌শিয়ান নালী এবং তার চারদিকের ল্যামেলাগুলি নিয়ে একটি **হ্যাভার্‌শিয়ান মণ্ডল** তৈরী হয়। এইসব অস্থিতে এইরকম অনেকগুলি করে হ্যাভার্‌শিয়ান মণ্ডল থাকে। বিভিন্ন হ্যাভার্‌শিয়ান মণ্ডলের




13 নং চিত্র— অস্থি : ক. লম্বা অস্থির অংশ-বিশেষ ; খ. একটি হ্যাভার্‌শিয়ান মণ্ডল ; গ. একটি অস্থি-কোষ।

নালীগুলি একে অন্যের সঙ্গে যুক্ত হয়, এবং এই যুক্ত নালীগুলি অস্থির কেন্দ্রে অবস্থিত মজ্জা-গহ্বরের সঙ্গে মিলিত হয়। মজ্জা-গহ্বরের মধ্যে অস্থি-মজ্জা থাকে। ল্যামেলাগুলিতে অনেক ছোট-বড় গহ্বর থাকে। এই গহ্বরের নাম **ল্যাক্যুনা** (Lacuna)†। ল্যাক্যুনার মধ্যে শাখা-প্রশাখাযুক্ত **অস্থি-কোষ** বা **অস্‌টিওব্লাস্‌ট** (Osteoblast) থাকে। ল্যাক্যুনাগুলি আবার কতকগুলি শাখা-প্রশাখাযুক্ত নালিকা দিয়ে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত থাকে। এই নালিকাগুলির নাম ক্যানালিক্যুলি (Canaliculi)। অস্থির চারদিকে **পেরিঅস্‌টিয়াম** (Periostium) নামের তন্তুময় যোগ-কলার একটি আবরণ থাকে।

* একবচন ; ল্যামিলি (Lamellae)— বহুবচন।
† একবচন ; ল্যাক্যুনি (Lacunae)— বহুবচন।

**রক্ত**: এই যোগ-কলার ধাত্র তরল। এর নাম **রক্তমস্তু** বা **রক্তরস**। ধাত্র তরল হওয়ায়, রক্তকে তরল যোগ-কলা বলা হয়। এই কলার কোষগুলিকে রুধিরকণিকা বা রক্তকণিকা বলে।

রক্তরস প্রায় বর্ণহীন (ঈষদ হলুদ রঙের), স্বচ্ছ এবং মৃদু ক্ষারীয়। এর প্রায় 92% জল। রক্তরসে খনিজ লবণ, কয়েক ধরনের প্রোটীন (Protein), গ্লুকোজ ইত্যাদি খাদ্য, রেচন-পদার্থ, হরমোন (Hormones), ভাইটামিন (Vitamins) এবং অক্সিজেন ও কার্বন ডাই-অক্সাইড নামের গ্যাস দ্রবীভূত থাকে।

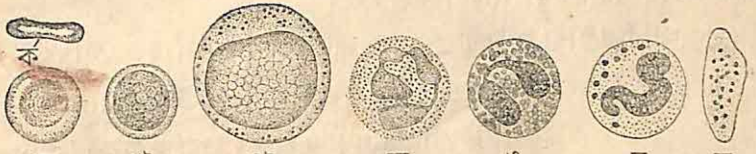
রক্তকণিকা তিন ধরনের। **লোহিত রক্তকণিকা** বা **ইরাইথ্রোসাইট** (Erythrocytes) নামের রক্তকণিকারা সংখ্যায় সবচেয়ে বেশি (এক ঘন-মিলিমিটার মানুষের রক্তে প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ লোহিত রক্তকণিকা থাকে)। এরা বৃত্তাকার, দ্বি-অবতল এবং আকারে ছোট (1·9 মাইক্রা* পুরু, ব্যাস 7·5 থেকে 7·7 মাইক্রা)। স্তন্যপায়ী প্রাণীদের লোহিত রক্তকণিকায় নিউক্লিয়াস থাকে না। অন্যান্য মেরুদণ্ডী প্রাণীদের এই রক্তকণিকা ডিম্বাকার এবং নিউক্লিয়াস-যুক্ত। লোহিত রক্তকণিকার সাইটোপ্লাজমে **হিমোগ্লোবিন** (Haemoglobin) নামের একরকম লৌহ-ঘটিত প্রোটীনের কণা থাকে। এর রঙ লাল। সেইজন্য রক্তের রঙ-ও লাল। শ্বসনের জন্য অক্সিজেন বহন করা লোহিত রক্তকণিকার কাজ।

**শ্বেত রক্তকণিকা** বা **লিউকোসাইট** (Leucocytes) নামের দ্বিতীয় ধরনের রক্তকণিকাগুলি সংখ্যায় অনেক কম (এক ঘন-মিলিমিটার মানুষের রক্তে পাঁচ হাজার থেকে ন'হাজার শ্বেত রক্তকণিকা থাকে)। এদের কোনও নিজস্ব রঙ নেই; তবে এদের স্পষ্ট নিউক্লিয়াস থাকে। সাইটোপ্লাজমের প্রকৃতি এবং নিউক্লিয়াসের আকারের তারতম্য অনুযায়ী, শ্বেত রক্তকণিকাগুলিকে কয়েকটি দলে ভাগ করা হয়। রোগ-জীবাণুর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা এদের প্রধান কাজ।

---

* মাইক্রা (Micra)— বহুবচন; মাইক্রন (Micron)— একবচন। 1 মাইক্রন =0·001 মিলিমিটার।

তৃতীয় ধরনের রক্তকণিকার নাম **অণুচক্রিকা** বা **থ্রম্বোসাইট** (Thrombocytes)। এরা লোহিত রক্তকণিকার চেয়েও ছোট (ব্যাস 2 থেকে 4 মাইক্রো)। এরা মোটামুটি ডিম্বাকার। অণু-চক্রিকায় নিউক্লিয়াস থাকে না। দেহের কোনও জায়গা কেটে গেলে,




14 নং চিত্র— মানুষের রক্তকণিকা : ক. লোহিত রক্তকণিকা (পৃষ্ঠদৃশ্য) ; খ. লোহিত রক্তকণিকা (পার্শ্বদৃশ্য) ; গ. থেকে চ. বিভিন্ন ধরনের শ্বেত রক্তকণিকা (পৃষ্ঠদৃশ্য) ; ছ. অণুচক্রিকা (পৃষ্ঠদৃশ্য)।

ঐ কাটা জায়গা থেকে যে রক্ত পড়ে, কিছুক্ষণ পরে সেই রক্ত জমাট বেঁধে যায়। একে রক্তের তঞ্চন বলে। অণুচক্রিকারা রক্তের তঞ্চনে সাহায্য করে।

দেহের কোষে কোষে অক্সিজেন ও খাদ্য পৌঁছে দেওয়া এবং কোষ থেকে কার্বন ডাই-অক্সাইড ও রেচন-পদার্থ বয়ে নিয়ে আসা রক্তের প্রধান কাজ। এছাড়া, নানারকম ভাইটামিন, হরমোন ও খনিজ লবণ রক্ত-বাহিত হয়ে দেহের এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যেতে পারে। রোগ-জীবাণুদের মেরে ফেলে, রোগ-প্রতিরোধে সাহায্য করা-ও রক্তের কাজ।

***পেশী-কলা*** **:** প্রাণীদের মাংস যে কলা দিয়ে গঠিত, বিজ্ঞানের ভাষায় তাকে পেশী-কলা বলে। মানুষের সমস্ত পেশী-কলার ওজন দেহের মোট ওজনের 40% থেকে 50%।

পেশী-কলার কোষগুলি সরু এবং লম্বা। সেইজন্য এদের **পেশী-তন্তু** বলা হয়। এই কলা সঙ্কোচী অর্থাৎ, সঙ্কুচিত হতে পারে।

বিভিন্ন পেশী-কলার সঙ্কোচনের ফলে দেহের বিভিন্ন অংশ নড়াচড়া করতে পারে ; ফলে, পরিপাক, শ্বসন, সংবহন ইত্যাদি চলা

সম্ভব হয়। অস্থি-সংলগ্ন পেশীগুলির সঙ্কোচনে প্রাণীরা এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যেতে পারে।

গঠন ও ধর্মের পার্থক্য অনুযায়ী, পেশী-কলা তিন ধরনের। যেমন — (1) রেখা-বিহীন পেশী, (2) সরেখ পেশী এবং (3) হৃৎ-পেশী। নিচে এদের সম্বন্ধে আলোচনা করা হল।

**রেখা-বিহীন পেশী ঃ** এই রকম পেশী-কলার কোষগুলি সচরাচর 15 থেকে 500 মাইক্রা লম্বা এবং 6 মাইক্রা চওড়া। এরা দুই প্রান্তে সরু। প্রতি কোষে (বা তন্তুতে) একটি লম্বাটে নিউক্লিয়াস থাকে। এদের সাইটোপ্লাজ্মের মধ্যে অনেকগুলি খুব সূক্ষ্ম সুতার মতো বস্তু কোষের দৈর্ঘ্য-বরাবর সাজানো থাকে। এইগুলির নাম **মা'য়োফাইব্রিল** (Myofibril)।

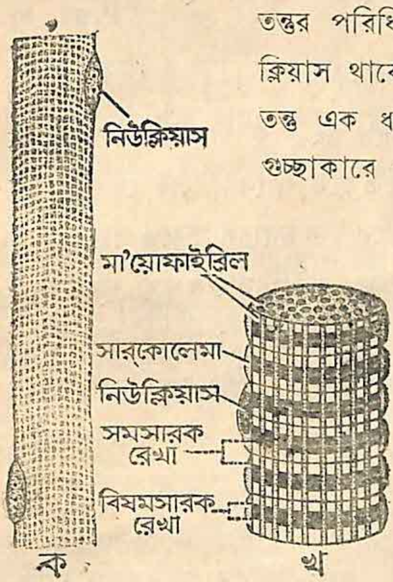


15 নং চিত্র— তিনটি রেখা-বিহীন পেশী-কোষ।

দেহ-গহ্বরের মধ্যের বিভিন্ন অঙ্গ যেমন, পাকস্থলী, অন্ত্র এবং বড় বড় রক্তবাহ ইত্যাদির প্রাকারে রেখা-বিহীন পেশী পাওয়া যায়। এই পেশী-কলার সঙ্কোচনের ফলেই পাকস্থলী ও অন্ত্রের মধ্য দিয়ে খাদ্য পরিচালিত হয়। রেখা-বিহীন পেশীর সঙ্কোচন প্রাণীর ইচ্ছার উপর নির্ভর করে না। সেইজন্য, এই পেশীকে **অনৈচ্ছিক পেশী**-ও বলা হয়। অনৈচ্ছিক পেশীর সঙ্কোচন খুব ধীরে ধীরে হয়।

**সরেখ পেশী ঃ** এই পেশী-কলার তন্তুগুলি আণুবীক্ষণিক দণ্ডের মতো, 4 সেন্টিমিটার পর্যন্ত লম্বা এবং 10 থেকে 100 মাইক্রা পুরু হয়। তন্তুগুলির লম্বা অক্ষ-বরাবর অনেকগুলি মা'য়োফাইব্রিল থাকে। এই পেশী-কলার তন্তুতে অনেকগুলি স্বচ্ছ এবং অস্বচ্ছ অনুপ্রস্থ রেখা একান্তরভাবে (অর্থাৎ, স্বচ্ছ রেখার পর অস্বচ্ছ রেখা, তারপর আবার স্বচ্ছ রেখা— এইভাবে) বিন্যস্ত থাকে। স্বচ্ছ রেখাকে **সমসারক রেখা** এবং অস্বচ্ছ রেখাকে **বিষমসারক রেখা** বলে। এই

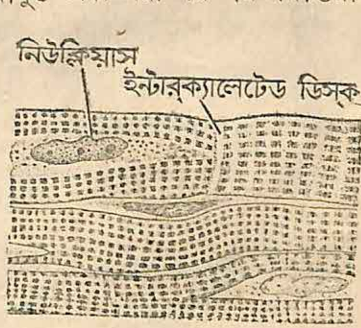
ধরনের পেশী-তন্তু **সার্কোলেমা** (Sarcolemma) নামের প্রোটো-প্লাজ্‌ম-নির্মিত এক বিশেষ ধরনের সূক্ষ্ম আবরণ দিয়ে আবৃত থাকে। তন্তুর পরিধির দিকে কয়েকশ' লম্বাটে নিউ-ক্লিয়াস থাকে। এইরকম অনেকগুলি পেশী-তন্তু এক ধরনের যোগ-কলার আবরণ দিয়ে গুচ্ছাকারে আবদ্ধ থাকে। কঙ্কালের সঙ্গে আটকানো পেশীগুলি এই ধরনের পেশী-কলা দিয়ে গঠিত। এই পেশীর সঙ্কোচন প্রাণীর ইচ্ছার উপর নির্ভর করে বলে, এদের অন্য নাম **ঐচ্ছিক পেশী**। ঐচ্ছিক পেশীর সঙ্কোচন খুব তাড়াতাড়ি হয়। এই পেশী-কলার সঙ্কোচনের ফলে হাত-পা নাড়াচাড়া এবং স্থানান্তরে যাওয়া সম্ভব হয়।




16 নং চিত্র— সরেখ পেশী : ক. একটি সরেখ পেশী-কোষের অংশ-বিশেষ ; খ. সরেখ পেশীর গঠন (চিত্ররূপ)।

**হৃৎ-পেশী :** গঠনের দিক দিয়ে হৃৎ-পেশী প্রায় সরেখ পেশীর মতো। তবে, এর কোষগুলি শাখাযুক্ত এবং এরা পরস্পর সমান্তরাল-ভাবে না থেকে, একে অন্যের সঙ্গে শাখা দিয়ে যুক্ত থাকে। এই তন্তুগুলির সার্কোলেমা খুব সূক্ষ্ম।

হৃৎ-পেশীর নিউক্লিয়াসগুলি সরেখ পেশীর মতো। কিন্তু, এরা পরিধির দিকে থাকে না, কোষের কেন্দ্রের দিকে, প্রায় মা'য়োফাইব্রিল-শূন্য সাইটোপ্লাজ্‌মের মধ্যে থাকে। এই

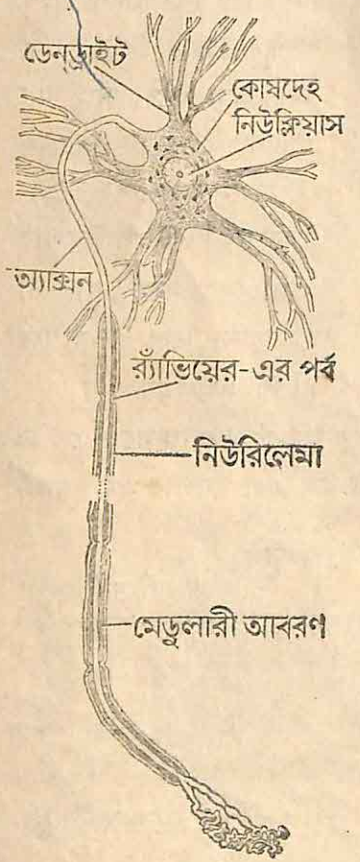



17 নং চিত্র— হৃৎ-পেশী।

কলায় কতকগুলি সোজা অথবা আঁকাবাঁকা, স্পষ্ট অনুপ্রস্থ রেখা দেখা যায়। এইগুলির নাম **ইণ্টারক্যালেটেড ডিস্ক** (Intercalated disk)।

হৃৎপিণ্ড হৃৎ-পেশী দিয়ে তৈরী। এই পেশীর সঙ্কোচন প্রাণীর ইচ্ছার অধীন নয়। অতএব, ধর্মের দিক দিয়ে হৃৎ-পেশী অনৈচ্ছিক। হৃৎ-পেশী খুব তাড়াতাড়ি এবং নিয়মিত সঙ্কুচিত হতে পারে। এই পেশী-কলার সঙ্কোচনের ফলে হৃৎপিণ্ডের মধ্য দিয়ে রক্ত চলাচল করতে পারে।

***নার্ভ* (Nerve)-*কলা* ঃ** মগজ অর্থাৎ মস্তিষ্ক এবং সুষুম্নাকাণ্ড এক ধরনের সাদাটে কলা দিয়ে তৈরী। এরই নাম নার্ভ-কলা। দেহের মধ্যে যে অসংখ্য সাদা সুতার মতো স্নায়ু বা নার্ভ থাকে, তারা-ও নার্ভ-কলা দিয়ে তৈরী।




18 নং চিত্র— নার্ভ-কোষ।

**নার্ভ-কোষ বা নিউরোন** (Neurone) নামের এক ধরনের বিশিষ্ট কোষই নার্ভ-কলার প্রধান উপকরণ। নিউরোনের প্রধান অংশকে বলা হয় **কোষদেহ**। কোষদেহের পরিধি অনিয়মিত। এর নিউক্লিয়াসটি বেশ বড়। কোষদেহের সাইটোপ্লাজমে কতকগুলি দানার মতো বস্তু থাকে। কোষদেহের পরিধির সঙ্গে অনেকগুলি লম্বা লম্বা অংশ যুক্ত থাকতে দেখা যায়। এই লম্বা লম্বা অংশগুলি আবার দুধরনের। **ডেনড্রাইট** (Dendrite) বা **ডেনড্রন** (Dendron) নামের লম্বা অংশগুলির শাখা খুব বেশি লম্বা থাকে। এরা হয়না।

**অ্যাক্সন** (Axon) নামের অন্য লম্বা অংশটি সচরাচর শাখা-বিহীন এবং খুব (এক মিটারেরও বেশি) লম্বা হয়। কোষদেহ নার্ভ-কোষের সমস্ত কাজ নিয়ন্ত্রণ করে। ডেন্‌ড্রাইটগুলি কোষদেহের দিকে নার্ভ-স্পন্দন বহন করে নিয়ে যায়। কোষদেহ থেকে অন্য নিউরোনের দিকে অথবা জ্ঞানেন্দ্রিয়ের দিকে নার্ভ-স্পন্দন বয়ে নিয়ে যাওয়া অ্যাক্সনের কাজ।

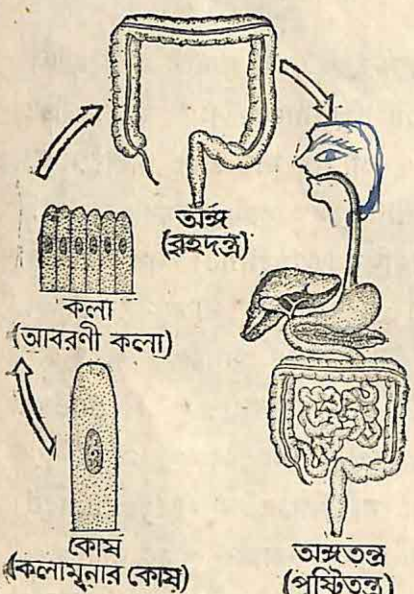
অ্যাক্সনের চারদিকে নিউক্লিয়াস-যুক্ত একটি আবরণ থাকে। এই আবরণের নাম **নিউরিলেমা** (Neurilemma)। নিউরিলেমা-বেষ্টিত অ্যাক্সনকে **নার্ভ-তন্তু** বলা হয়। অনেক নার্ভ-তন্তুর নিউরিলেমার ভিতরের দিকে **মেডুলারী** (Medullary) **আবরণ** নামের আর একটি পুরু আবরণ থাকে। একে **মাইলিন** (Myeline) **আবরণ**-ও বলা হয় নার্ভ-তন্তুর দৈর্ঘ্য-বরাবর মাইলিন আবরণ মাঝে মাঝে বিচ্ছিন্ন থাকে। ফলে, ঐ সমস্ত অঞ্চলে নিউরিলেমা অ্যাক্সনের কাছে চলে আসে। নার্ভ-তন্তুর এই অংশকে **র‍্যাঁভিয়ের-এর পর্ব** (Node of Ranvier) বলে। মেডুলারী বা মাইলিন আবরণ-যুক্ত নার্ভ-তন্তুকে **মেডুলেটেড** (Medullated) বা **মাইলিনেটেড** (Myelinated) নার্ভ-তন্তু বলে। অনেক নার্ভ-তন্তুর মেডুলারী আবরণ থাকে না। এদের নাম **নন্‌-মেডুলেটেড** (Non-medullated) বা **নন্‌-মাইলিনেটেড** (Non-myelinated) নার্ভ-তন্তু। যোগ-কলার আবরণ দিয়ে বেষ্টিত একগুচ্ছ নার্ভ-তন্তুকে **নার্ভ** (Nerve) বলা হয়। মোটা মোটা নার্ভে, অবশ্য, অনেকগুলি করে নার্ভ-তন্তুর গুচ্ছ থাকে। নার্ভ-কোষ ছাড়া, নার্ভ-কলায় **নিউরোগ্লিয়া** (Neuroglia) নামের আর এক ধরনের অপরিণত আনুষঙ্গিক কোষ থাকে।

পরিবেশের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করা এবং দেহের বিভিন্ন অংশের কাজের সমন্বয়-সাধন ও নিয়ন্ত্রণ করা নার্ভ-কলার কাজ।

**অঙ্গ ঃ** প্রাণিদেহের বিভিন্ন অংশের কাজ নির্দিষ্ট। যেমন, পাকস্থলীর কাজ খাদ্য পরিপাক করা। পাকস্থলী আবরণী-কলা, যোগ-কলা এবং পেশী-কলা দিয়ে গঠিত। এইরকম দুটি কিংবা তার বেশি

বিভিন্ন রকম কলা মিলে কোনও নির্দিষ্ট কাজ করার জন্য দেহের কোনও অংশ গঠন করলে, তাকে **অঙ্গ** বলা হয়। অতএব, পাকস্থলী একটি অঙ্গ। প্রাণিদেহে এইরকম অনেক অঙ্গ থাকে। মস্তিষ্ক, বৃক্ক, যকৃৎ, হৃৎপিণ্ড ইত্যাদি অঙ্গের উদাহরণ।

অঙ্গতন্ত্র ঃ মুখ-বিবর, অন্ননালী, পাকস্থলী, ক্ষুদ্রান্ত্র, বৃহদন্ত্র, পায়ু, লালা-গ্রন্থি, যকৃৎ, পিত্তাশয়, অগ্ন্যাশয় ইত্যাদি অঙ্গের নিজ নিজ কাজ আছে। তবু, এরা সকলে মিলে খাদ্য-গ্রহণ, পরিপাক, পাচিত খাদ্য শোষণ এবং খাদ্যের অপাচ্য অংশের বহিষ্করণ, অর্থাৎ, পুষ্টি-সাধন করে। কতকগুলি অঙ্গ এইরকম পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে কোনও উল্লেখযোগ্য শারীর-বৃত্তীয় কাজ করলে, ঐ অঙ্গগুলিকে একসঙ্গে একটি **অঙ্গতন্ত্র** বলা হয়। পাকস্থলী ইত্যাদি অঙ্গগুলি যে অঙ্গতন্ত্র গঠন করে, তার নাম পুষ্টিতন্ত্র। পুষ্টি-সাধনই এই অঙ্গতন্ত্রের কাজ।




19 নং চিত্র— কোষ, কলা, অঙ্গ ও অঙ্গতন্ত্রের পারস্পরিক সম্পর্ক।

মানুষ, ব্যাঙ এবং অন্যান্য উন্নততর প্রাণীদের দেহ মোটামুটি নটি নির্দিষ্ট অঙ্গতন্ত্র দিয়ে গঠিত। নিচে ব্যাঙের অঙ্গতন্ত্রগুলির কাজ এবং বিভিন্ন অঙ্গের নাম দেওয়া হল।

(1) **কঙ্কাল-তন্ত্র**— করোটি, মেরুদণ্ড, উরশ্চক্র, শ্রোণীচক্র এবং অগ্রপদ ও পশ্চাৎ-পদের অস্থিগুলি নিয়ে কঙ্কাল-তন্ত্র গঠিত। কঙ্কাল-তন্ত্র দেহের অভ্যন্তরীণ কাঠামো তৈরি করে এবং দেহের ভর বহন করে।

(2) **পেশীতন্ত্র**— দেহের বিভিন্ন অস্থির সঙ্গে যুক্ত সরেখ পেশী-কলা দিয়ে তৈরী পেশীগুলি নিয়ে এই অঙ্গতন্ত্র গঠিত। চলন ও গমনে সাহায্য করা এই অঙ্গতন্ত্রের কাজ।

(3) **পুষ্টিতন্ত্র**— মুখ-বিবর, অন্ননালী, পাকস্থলী, ক্ষুদ্রান্ত্র, বৃহদন্ত্র, অবসারণী, অবসারণী-ছিদ্র, যকৃৎ, পিত্তাশয় এবং অগ্ন্যাশয় নিয়ে পুষ্টি-তন্ত্র গঠিত। পুষ্টি-সাধন এই অঙ্গতন্ত্রের কাজ।

(4) **সংবহন-তন্ত্র**— হৃৎপিণ্ড, ছোট-বড় ধমনী ও শিরা, রক্ত, লসিকা এবং লসিকায়নী নিয়ে ব্যাঙের সংবহন-তন্ত্র গঠিত। দেহের বিভিন্ন অংশে রক্ত ও লসিকা সংবহন করা এই অঙ্গতন্ত্রের কাজ।




20 নং চিত্র— কুনো ব্যাঙের বিভিন্ন অঙ্গতন্ত্র (পার্শ্ব-দৃশ্য) : ক. কঙ্কাল-তন্ত্র; খ. পেশী-তন্ত্র; গ. পুষ্টিতন্ত্র; ঘ. রক্ত-সংবহনতন্ত্র; ঙ. শ্বসন-তন্ত্র; চ. রেচন-তন্ত্র; ছ. নার্ভ-তন্ত্র; জ. অন্তঃক্ষরা-গ্রন্থিতন্ত্র; ঝ. জনন-তন্ত্র।

(5) **শ্বসন-তন্ত্র** —নাসারন্ধ্র, নাসাপথ, মুখ-বিবর ও গলবিল, শ্বাসরন্ধ্র, ক্লোমশাখা এবং ফুস্ফুস নিয়ে ব্যাঙের শ্বসন-তন্ত্র গঠিত। শ্বসনই এর কাজ।

(6) **রেচন-তন্ত্র**— বৃক্ক, গবিনী, মূত্রাশয় অবসারণী এবং অব-

সারণী-ছিদ্র নিয়ে এই অঙ্গতন্ত্র গঠিত। রেচন অর্থাৎ, বিপাকের ফলে উদ্ভূত বর্জ্য পদার্থ দূরীকরণ রেচন-তন্ত্রের কাজ।

(7) **নার্ভ-তন্ত্র**— মস্তিষ্ক, সুষুম্নাকাণ্ড, করোটিক-নার্ভ এবং সুষুম্না-নার্ভ নিয়ে ব্যাঙের নার্ভ-তন্ত্র গঠিত। পরিবেশের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করা এবং দেহের বিভিন্ন অঙ্গের কাজের সমন্বয় সাধন করা এই অঙ্গ-তন্ত্রের কাজ।

(8) **অন্তঃক্ষরা-গ্রন্থিতন্ত্র**— পিট্যুইটারি (Pituitary), থাইরয়েড (Thyroid), অ্যাড্রিনাল (Adrenal), ডিম্বাশয় ও শুক্রাশয় এবং অগ্ন্যাশয়ের অন্তঃক্ষরা অংশ নিয়ে অন্তঃক্ষরা-গ্রন্থিতন্ত্র গঠিত। বৃদ্ধি, জনন ইত্যাদির রাসায়নিক নিয়ন্ত্রণ করা এই গ্রন্থিগুলির কাজ।

(9) **জনন-তন্ত্র**— শুক্রাশয় (অথবা ডিম্বাশয়), শুক্রনালী (অথবা ডিম্বনালী), অবসারণী এবং অবসারণী-ছিদ্র নিয়ে জনন-তন্ত্র গঠিত। বংশবৃদ্ধি করা এই অঙ্গতন্ত্রের কাজ।

পরের পরিচ্ছেদে কুনো ব্যাঙের কঙ্কাল-তন্ত্র, পুষ্টিতন্ত্র, সংবহন-তন্ত্র, শ্বসন-তন্ত্র, রেচন-তন্ত্র, নার্ভ-তন্ত্র এবং জনন-তন্ত্রের বিভিন্ন অঙ্গের গঠন ও কাজ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা দ্রষ্টব্য।

## অনুশীলনী

1. প্রধান চার রকম প্রাণিকলার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও। এরা কে কি কাজ করে, তা উল্লেখ কর।

2. রক্তের গঠন ও কাজ সংক্ষেপে বর্ণনা কর। রক্তকণিকাগুলির ছবি আঁক।

3. নিচের বক্তব্যগুলির যেটি ঠিক, তার পাশে 'হ্যাঁ' এবং যেটি ভুল, তার পাশে 'না' লেখ :—

(ক) এক ধরনের আবরণী কলা থেকে লালা নিঃসৃত হয়; (খ) দেহের বিভিন্ন অঙ্গের মধ্যে যোগ-সাধন করা পেশী-কলার কাজ; (গ) কণ্ডরা এক ধরনের তন্তুময় যোগ-কলা; (ঘ) অস্থিকলায় তন্তু থাকে; (ঙ) রক্ত তরল

যোগ-কলা ; (চ) সরেখ পেশীর অপর নাম অনৈচ্ছিক পেশী ; (ছ) মস্তিষ্ক নার্ভ-কলা দিয়ে তৈরী।

4. শূন্যস্থান পূরণ কর :—

(ক) নাক ও গলার — কলা থেকে শ্লেষ্মা নিঃসৃত হয় ; (খ) থাইরয়েড নামের অনাল গ্রন্থিতে — এপিথিলিয়াম দেখা যায় ; (গ) ধাত্র — কলার বৈশিষ্ট্য ; (ঘ) সন্ধিবন্ধনী — যোগ-কলা দিয়ে তৈরী ; (ঙ) কোমলাস্থি কলার কোষগুলির নাম — ; (চ) পাকস্থলীর প্রাকারে — পেশী পাওয়া যায়।

5. নিচের প্রথম অনুচ্ছেদের কোনটির সঙ্গে দ্বিতীয় অনুচ্ছেদের কোনটি খাটবে, তা লেখ :—

(অ) শ্লেষ্মঝিল্লী ; (আ) হ্যাভার্‌শিয়ান নালী ; (ই) অণুচক্রিকা ; (ঈ) কোষদেহ ; (উ) হিমোগ্লোবিন ; (ঊ) সমসারক রেখা ; (ঋ) ইণ্টারক্যালেটেড ডিস্‌ক।

(ক) হৃৎ-পেশী ; (খ) লোহিত রক্তকণিকা ; (গ) সরেখ পেশী ; (ঘ) আবরণী কলা ; (ঙ) নিউরোন ; (চ) রক্ত ; (ছ) অস্থি।

---

# প্রাণীদের অঙ্গতন্ত্রের বিবরণ 4

আগের পরিচ্ছেদে প্রাণীদের কলা, অঙ্গ এবং অঙ্গতন্ত্র সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। এই পরিচ্ছেদে আরসোলা ও কেঁচো—এই দুটি অমেরুদণ্ডী প্রাণীর, এবং কুনো ব্যাঙ নামের মেরুদণ্ডী প্রাণীর প্রধান প্রধান অঙ্গতন্ত্রের গঠন ও কাজ সম্বন্ধে সাধারণ ধারণা দেওয়া হল।

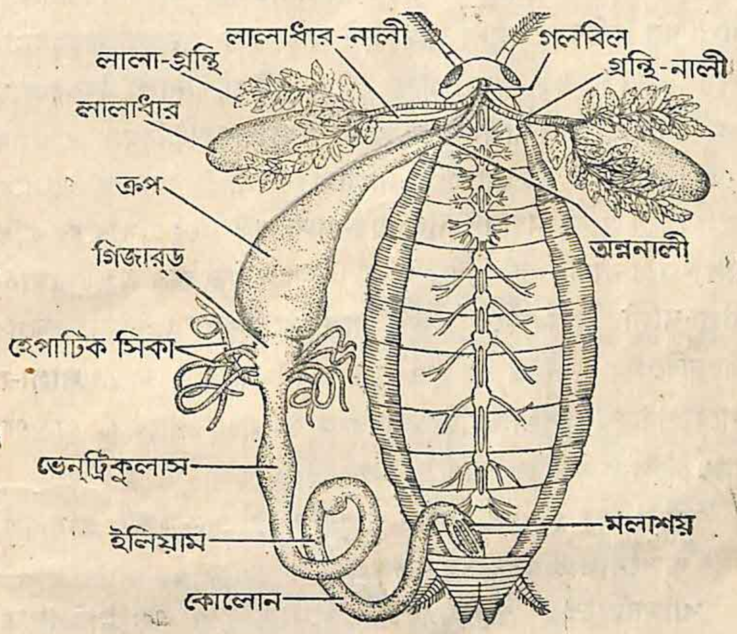
**আরসোলার অঙ্গতন্ত্র ঃ** আরসোলা অতি পরিচিত সন্ধিপদী প্রাণী। নিচের অনুচ্ছেদগুলিতে আরসোলার পুষ্টিতন্ত্র, শ্বসন-তন্ত্র, রক্ত-সংবহন-তন্ত্র, নার্ভ-তন্ত্র এবং জনন-তন্ত্রের সাধারণ বিবরণ দেওয়া হল।

***পুষ্টিতন্ত্র ঃ*** পৌষ্টিক নালী এবং লালা-যন্ত্র নিয়ে আরসোলার পুষ্টিতন্ত্র গঠিত।

পৌষ্টিক নালী ঃ আরসোলার পৌষ্টিক নালী দেহের সামনের দিকে অবস্থিত মুখ থেকে শুরু করে, দেহের পিছনদিকে অবস্থিত পায়ু পর্যন্ত বিস্তৃত এবং নলের মতো দেখতে। এর কোনও অংশ সরু, কোনও অংশ মোটা, কিছু অংশ সোজা, কিছু অংশ প্যাঁচানো।

আরসোলার মস্তিষ্কের সামনের অংশে মুখোপাঙ্গ থাকে। মুখোপাঙ্গগুলির গোড়ায় আরসোলার ছোট (1) **মুখ** থাকে। খাদ্য গ্রহণ করা মুখের কাজ। মুখের ঠিক পরের অংশের নাম (2) **মুখ-বিবর**। মুখ-বিবরের পিছনদিকে একটি সরু নলের মতো অংশ থাকে। এর নাম (3) **গলবিল**। গলবিল মস্তিষ্কের নিচের দিক দিয়ে দেহের পিছনদিকে চলে যায়। গলবিলের পরের অংশের নাম (4) **অন্ননালী**। এটি সরু ও লম্বা। অন্ননালীর পরে পৌষ্টিক নালী ক্রমে মোটা হয়ে যায় এবং দেখতে থলির মতো ; এর নাম (5) **ক্রপ** (Crop)। এটি বুকের শেষের দিক থেকে পেটের প্রথম দিক পর্যন্ত বিস্তৃত। মুখ দিয়ে গৃহীত খাদ্য ক্রমে মুখ-বিবর, গলবিল ও অন্ননালীর

মধ্য দিয়ে ক্রপে এসে কিছুক্ষণ জমা থাকে। এখানে খাদ্য পরিপাকও হয়। ক্রপের পর ছোট শক্ত তিন-কোণা একটি অংশ আছে। একে (6) **গিজারড (Gizzard)** বলে। খাদ্য পেষা গিজারডের কাজ। গিজারড এবং পৌষ্টিক নালীর পরবর্তী অংশের সংযোগ-স্থলে আটটি সরু, এক-মুখ-বন্ধ নলের মতো অংশ থাকে। এদের নাম (7) **হেপাটিক সিকা** (Hepatic caeca) বা **গ্যাসট্রিক সিকা** (Gastric caeca).।




21 নং চিত্র— আরসোলার পুষ্টিতন্ত্র।

এদের পরে পৌষ্টিক নালীর যে অংশ, তার নাম (8) **ভেনট্রিকুলাস** (Ventriculus)। এটি অল্প মোটা, প্যাঁচানো নলের মতো। এখানে খাদ্য পরিপাক ও শোষণ হয়। হেপাটিক সিকার খোলা মুখ ভেনট্রি-কুলাসের গহ্বরের সঙ্গে যুক্ত। এরা নানারকম উৎসেচক নিঃসরণ করে। ভেনট্রিকুলাসের পরের অংশ অল্প সরু, ছোট নলের মতো। একে (9) **ইলিয়াম** (Ileum) বলে। জল শোষণ করা এর কাজ। ইলিয়ামের পরের অংশের নাম (10) **কোলন** (Colon)। এটি মোটা

নলের মতো। এরও কাজ জল শোষণ করা। এর পরে থাকে (11) **মলাশয়**। এটি পৌষ্টিক নালীর শেষ অংশ। এর মাঝখানে মোটা। জল শোষণ করা এবং মল জমা করে রাখা মলাশয়ের কাজ। মলাশয় শেষ দেহ-খণ্ডকের নিচের দিকে অবস্থিত একটি ছিদ্রের সঙ্গে যুক্ত। এই ছিদ্রই (12) **পায়ু**। পায়ু দিয়ে মল নির্গত হয়।

**লালা-যন্ত্র**ঃ আরসোলার বক্ষ-গহ্বরে, অন্ননালী ও ক্রপের দু-পাশে অবস্থিত দুটি **লালা-গ্রন্থি,** দুটি **লালাধার** এবং এদের নালী নিয়ে **লালা-যন্ত্র** গঠিত। লালা-গ্রন্থি দুটি দুই গুচ্ছ পাতার মতো অংশ দিয়ে তৈরী। দুটি লালা-গ্রন্থি থেকে দুটি **গ্রন্থি-নালী** উৎপন্ন হয়ে একটি **সাধারণ গ্রন্থি-নালী** তৈরি করে। লালাধার দুটি ডিম্বাকার থলির মতো। লালাধার দুটি থেকে দুটি **লালাধার-নালী** উৎপন্ন হয়ে, একসঙ্গে মিলে গিয়ে একটি **সাধারণ লালাধার-নালী** সৃষ্টি করে। সাধারণ গ্রন্থি নালী আর সাধারণ লালাধার-নালী একসঙ্গে যুক্ত হয়ে একটি মোটা **লালা-নালী** তৈরি করে। এই নালী মুখোপাঙ্গের গোড়ায়, মুখের পিছনদিকে একটি ছিদ্রপথে যুক্ত হয়। এই ছিদ্র দিয়ে নিঃসৃত **লালা**-য় কার্বোহাইড্রেট-পরিপাককারী নানারকম উৎসেচক থাকে। অতএব, খাদ্য পরিপাক করা লালা-যন্ত্রের কাজ।

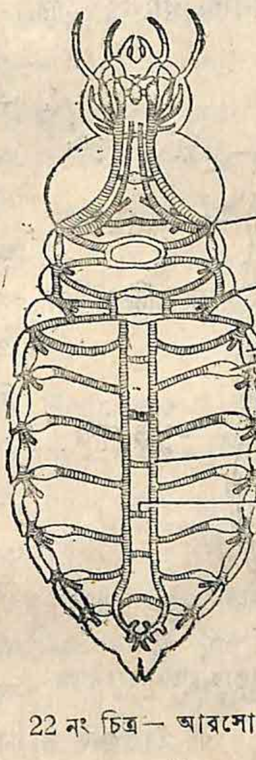
***শ্বসন-তন্ত্র* ঃ** দশ জোড়া শ্বাসছিদ্র এবং অনেকগুলি শ্বাসনালী নিয়ে আরসোলার শ্বসন-তন্ত্র গঠিত।

**শ্বাসছিদ্র**ঃ শ্বাসছিদ্রগুলির দুজোড়া বুকে এবং আট জোড়া পেটে থাকে। বুকের শ্বাসছিদ্রগুলিকে **বক্ষ-শ্বাসছিদ্র** বলে। মধ্যবক্ষের সামনের দিকে, প্রথম ও দ্বিতীয় পদের গোড়ার মাঝামাঝি জায়গায় একটি করে, দুপাশে দুটি শ্বাসছিদ্র থাকে। এদের নাম **মধ্যবক্ষ-শ্বাসছিদ্র**। বুকের অন্য শ্বাসছিদ্র জোড়াটি পশ্চাৎ-বক্ষের সামনের দিকে, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পদের গোড়ার মাঝামাঝি জায়গায় থাকে। এদের **পশ্চাৎ-বক্ষ-শ্বাসছিদ্র** বলে। বক্ষ-শ্বাসছিদ্রগুলির ঢাক্‌না থাকে।

পেটের শ্বাসছিদ্রগুলিকে **উদর-শ্বাসছিদ্র** বলা হয়। পেটের প্রথম দেহ-খণ্ডকের শেষভাগে, দেহের পাশের দিকে, কিছুটা পিঠের দিক

ঘেঁষে, একটি করে তুপাশে তুটি বড় শ্বাসছিদ্র থাকে। এরা প্রথম উদর-শ্বাসছিদ্র। বাকী উদর-শ্বাসছিদ্রগুলি দেহের তুপাশে পরপর অবস্থিত তুটি দেহ-খণ্ডকের মাঝামাঝি জায়গায় থাকে। উদর-শ্বাসছিদ্রগুলির ঢাক্‌না থাকে না।

**শ্বাসনালীঃ** বিভিন্ন শ্বাসছিদ্র থেকে একটি অথবা কয়েকটি শ্বাস-নালী উৎপন্ন হয়ে দেহের বিভিন্ন অংশে চলে যায় এবং পরস্পর মিলিত হয়ে একটি জটিল **শ্বাসনালী-তন্ত্র** গঠন করে। 22 নং চিত্রে আরসোলার শ্বাস-নালীগুলির বিন্যাস-ব্যবস্থা দেখানো হল। শ্বাসনালীগুলি বার-বার শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হয়ে, সরু সরু শাখা-শ্বাসনালী তৈরি করে। শাখা-শ্বাসনালী আবার বিভক্ত হয়ে সরু সরু **শ্বাসনালিকা** গঠন করে। শ্বাস-নালিকাগুলি সরাসরি কলার মধ্যে চলে যায়।

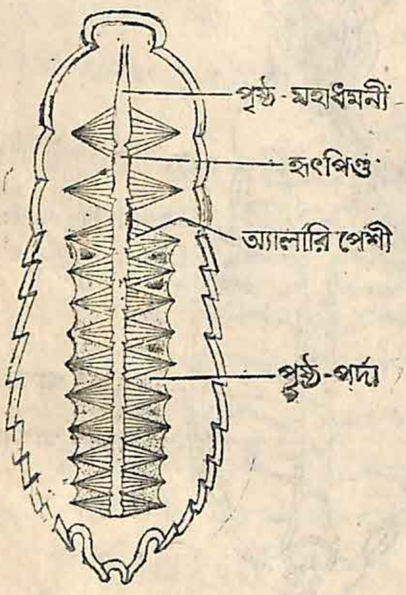



22 নং চিত্র— আরসোলার শ্বাসনালী-তন্ত্র।

শ্বাসছিদ্রগুলি দিয়ে আরসোলার দেহে অক্সিজেন-পূর্ণ বায়ু প্রবেশ করে, ক্রমে শ্বাসনালিকায় পৌঁছায়। শ্বাসনালিকার ভিতরের বায়ু এবং কলার মধ্যে অক্সিজেন ও কার্বন ডাই-অক্সাইডের আদান-প্রদান হয়। বড় বড় শ্বাসনালিগুলির জায়গায় জায়গায় নরম ফোলা অংশ থাকে। এদের নাম **বায়ুথলি**। বায়ুথলির সাহায্যেও গ্যাসের আদান-প্রদান অর্থাৎ, শ্বসন হয়।

**রক্ত-সংবহনতন্ত্র ঃ** আরসোলার রক্ত-সংবহনতন্ত্র একটি পৃষ্ঠ-বাহ, সাত জোড়া খণ্ডকস্থ বাহ, একজোড়া প্রধান আনুষঙ্গিক স্পন্দন-শীল অঙ্গ, বারো জোড়া অ্যালারি (Alary) পেশী, কয়েকটি পর্দা এবং হিমোসিল (Haemocoel) ও রক্ত নিয়ে গঠিত।

**পৃষ্ঠবাহ ঃ** দশম উদর-খণ্ডক থেকে মাথার পিছনদিক পর্যন্ত অংশের পিঠের দিকের দেহ-প্রাকারের ঠিক নিচে, মধ্যরেখা-বরাবর একটি প্রধান রক্তবাহ থাকে। এর নাম **পৃষ্ঠবাহ**। পৃষ্ঠবাহর নলাকার পিছনদিকের যে অংশ দশম উদর-খণ্ডক থেকে অগ্রবক্ষের সামনের দিক পর্যন্ত প্রসারিত, তাকে **হৃৎপিণ্ড** বলা হয়। হৃৎপিণ্ড অসম্পূর্ণভাবে তেরো টি প্রকোষ্ঠে বিভক্ত; প্রথম তিনটি প্রকোষ্ঠ বুকে এবং শেষ দশটি পেটে থাকে। প্রথম প্রকোষ্ঠটি ফুঁদেলের মতো, শেষ প্রকোষ্ঠটির পিছনদিক বন্ধ ও চাপা। দুটি প্রকোষ্ঠের মাঝামাঝি অংশে, হৃৎপিণ্ডের প্রাকারের দুপাশে ভাঁজ থাকে। এই ভাঁজগুলিতে একটি করে ছিদ্র থাকে। এই ছিদ্রগুলির নাম **অস্‌টিয়া** (Ostia)। অস্‌টিয়ার সংখ্যা মোট বারো জোড়া। হৃৎপিণ্ড স্পন্দনশীল। অস্‌টিয়ার মধ্য দিয়ে হৃৎপিণ্ডে রক্ত প্রবেশ করে। পৃষ্ঠবাহর সামনের দিকের বাকী অংশ অর্থাৎ, অগ্র-বক্ষের সামনের দিক থেকে মস্তকের পিছনদিক পর্যন্ত অংশ **পৃষ্ঠ-মহাধমনী** নামে পরিচিত। রক্ত হৃৎপিণ্ড থেকে পৃষ্ঠ-মহাধমনীর মধ্যে প্রবেশ করে।



23 নং চিত্র— আরসোলার রক্ত-সংবহনতন্ত্র।

**খণ্ডকস্থ বাহঃ** সাত জোড়া খণ্ডকস্থ বাহর দুজোড়া বুকে এবং পাঁচ জোড়া পেটে থাকে। এরা হৃৎপিণ্ড থেকে উৎপন্ন হয় এবং হৃৎপিণ্ডের সঙ্গে সমকোণে থাকে। এরা উপর-নিচে চ্যাপ্টা নলের মতো। রক্ত হৃৎপিণ্ড থেকে এদের মধ্যে প্রবেশ করে।

**আনুষঙ্গিক স্পন্দনশীল অঙ্গ ঃ** মাথার সামনের অংশে, শুঙ্গ দুটির গোড়ার মাঝামাঝি অঞ্চলে থলির মতো দুটি স্পন্দনশীল অঙ্গ থাকে। এদের নাম **আনুষঙ্গিক স্পন্দনশীল অঙ্গ**। এইগুলি থেকে একটি করে প্যাঁচানো নল উৎপন্ন হয়ে সেই পাশের শুঙ্গে প্রবেশ করে। এই স্পন্দনশীল অঙ্গ দুটির স্পন্দনে শুঙ্গে রক্ত প্রবেশ করে।

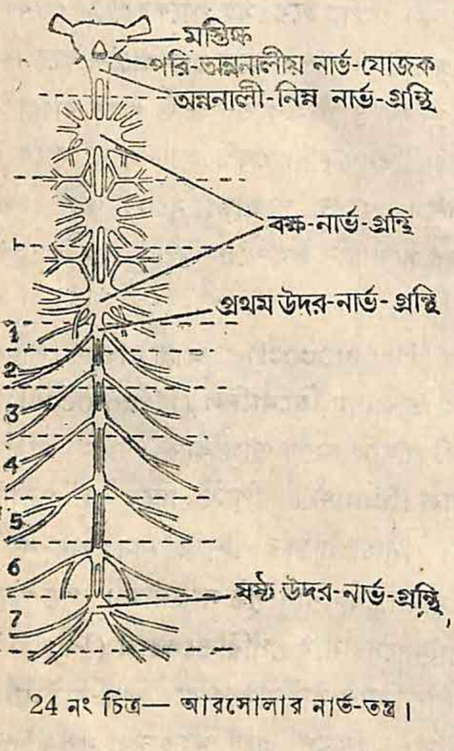
**অ্যালারি (Alary) পেশী ঃ** হৃৎপিণ্ডের প্রতি পাশে বারোটি করে, দুপাশে বারো জোড়া তিন-কোণা পেশী আট্‌কানো থাকে। এদের নাম **অ্যালারি পেশী**। এদের দুজোড়া বুকে এবং দশ জোড়া পেটে থাকে। এদের সঙ্কোচনে হৃৎপিণ্ডের মধ্যে রক্ত প্রবেশ করে।

**পর্দা ও হিমোসিল (Haemocoel) ঃ** আরসোলার দেহের মধ্যে যে ফাঁকা জায়গা থাকে, তার নাম **হিমোসিল** (Haemocoel)। দুটি পর্দা হিমোসিলকে তিনটি প্রধান অংশে ভাগ করে। হিমোসিলের এই অংশগুলির নাম **সাইনাস** (Sinus)। পিঠের দিকে যে পর্দাটি থাকে, তার নাম **পৃষ্ঠ-পর্দা**। নিচের দিকের পর্দাটির নাম **অঙ্ক-পর্দা**। পৃষ্ঠ-পর্দার উপরের দিকের সাইনাসের নাম **পৃষ্ঠ-সাইনাস**। পৃষ্ঠ-পর্দা ও অঙ্ক-পর্দার মাঝামাঝি সাইনাসের নাম **পেরিভিসেরাল** (Perivisceral) **সাইনাস**। অঙ্ক-পর্দার নিচের সাইনাসকে বলে **অঙ্ক-সাইনাস**।

আরসোলার রক্ত বর্ণহীন। রক্তরস এবং দুরকমের রক্তকণিকা নিয়ে রক্ত গঠিত। অ্যালারি পেশীর সঙ্কোচনের ফলে রক্ত পৃষ্ঠ-সাইনাস থেকে (অস্টিয়ার মধ্য দিয়ে) হৃৎপিণ্ডে প্রবেশ করে। হৃৎপিণ্ডের সঙ্কোচনে রক্ত হৃৎপিণ্ড থেকে পৃষ্ঠ-মহাধমনীর পথে বের হয়ে, মস্তকের দিকে চলে যায়। রক্ত বিভিন্ন সাইনাসে চালিত হয়, পরে আবার পৃষ্ঠ-সাইনাস থেকে হৃৎপিণ্ডে প্রবেশ করে।

**নার্ভ-তন্ত্র ঃ** আরসোলার নার্ভতন্ত্র দেহের অক্ষ-মধ্যরেখা-বরাবর বিন্যস্ত সুতার মতো একটি প্রধান অংশ নিয়ে গঠিত। এর সামনের অংশে থাকে **মস্তিষ্ক**। মস্তিষ্কটি আসলে পাশাপাশি অবস্থিত দুটি **অন্ননালী-উর্ধ্ব নার্ভ-গ্রন্থি** দিয়ে তৈরী। এই নার্ভ-গ্রন্থি দুটি অন্ননালীর প্রথম অংশের উপরের দিকে থাকে।

মস্তিষ্কের পিছনদিকের দুপাশ থেকে দুটি বেঁটে ও মোটা নার্ভ উৎপন্ন হয়ে, অন্ননালীকে বেষ্টন করে, অন্ননালীর নিচে অবস্থিত **অন্ননালী-নিম্ন নার্ভ-গ্রন্থি** নামের একজোড়া নার্ভ গ্রন্থির সঙ্গে যুক্ত হয়। এই নার্ভ দুটিকে **পরি-অন্ননালীয় নার্ভ-যোজক** বলে।




24 নং চিত্র— আরসোলার নার্ভ-তন্ত্র।

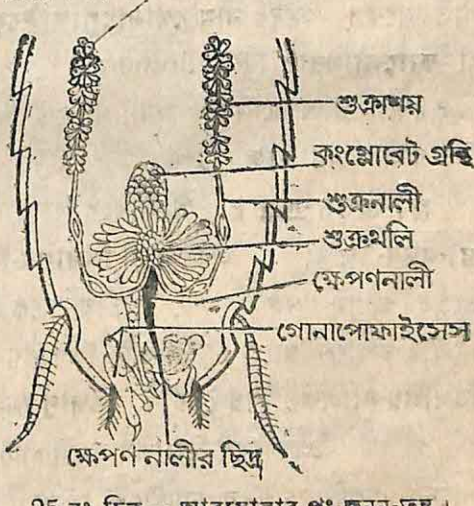
অন্ননালী-নিম্ন নার্ভ-গ্রন্থির অবস্থান মাথায়। বুকের তিনটি দেহ-খণ্ডকে একজোড়া করে মোট তিন জোড়া নার্ভ-গ্রন্থি থাকে। পেটের প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ এবং ষষ্ঠ ও সপ্তম খণ্ডকেও একজোড়া করে মোট ছয় জোড়া নার্ভ-গ্রন্থি থাকে। বুকের নার্ভ-গ্রন্থিগুলিকে **বক্ষ-নার্ভ-গ্রন্থি** বলে। তেমনিভাবে, পেটের নার্ভ-গ্রন্থিগুলির নাম **উদর নার্ভ-গ্রন্থি**। এই দশ (মাথার এক, বুকের তিন এবং পেটের ছয়) জোড়া নার্ভ-গ্রন্থিগুলি পরস্পর নার্ভ-যোজক দিয়ে জোড়া থাকে। ফলে, দেহের অক্ষ-মধ্যরেখা-বরাবর যে সুতার মতো অংশ গঠিত হয়, তার নাম **নার্ভ-সূত্র**।

মস্তিষ্ক এবং অন্ননালী-নিম্ন নার্ভ-গ্রন্থি থেকে কতকগুলি সরু নার্ভ উৎপন্ন হয়ে, চোখ, শুঙ্গ এবং মুখোপাঙ্গগুলিতে প্রবেশ করে। বুকের নার্ভ-গ্রন্থিগুলি থেকেও নার্ভ উৎপন্ন হয়ে তিনজোড়া পা এবং বুকের অন্যান্য অংশে চলে যায়। তেমনিভাবে, উদর-নার্ভ-গ্রন্থিগুলি থেকেও সরু সরু নার্ভ উৎপন্ন হয়ে শরীরের বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে পড়ে।

**জনন-তন্ত্র ঃ** আরসোলা **একলিঙ্গ** প্রাণী অর্থাৎ এর স্ত্রী-পুরুষ-ভেদ আছে। নিচে পুরুষ-আরসোলা ও স্ত্রী-আরসোলার জনন-তন্ত্র আলাদাভাবে বর্ণনা করা হল।

পুং-জনন-তন্ত্র ঃ পুরুষ-আরসোলার জনন-তন্ত্রকে আরসোলার **পুং-জনন-তন্ত্র** বলা হয়। এক জোড়া **শুক্রাশয়** আরসোলার পুং-জনন-তন্ত্রের প্রধান অঙ্গ। এরা লম্বাটে এবং তৃতীয় থেকে ষষ্ঠ উদর-খণ্ডের পৃষ্ঠ-দেহ-প্রাকারের ঠিক নিচে, দুপাশে অনুদৈর্ঘ্যভাবে থাকে। প্রতিটি শুক্রাশয় তিন-চারটি খণ্ডে বিভক্ত এবং প্রতি খণ্ডে গোল গোল গুটিকার মতো অসংখ্য অংশ থাকে। শুক্রাশয়ে **শুক্রাণু** উৎপন্ন হয়।

শুক্রাশয়ের শেষের দিক থেকে একটি করে সরু নলের মতো **শুক্রনালী** উৎপন্ন হয়ে দেহের পিছনদিকে চলে যায়; পরে আবার দেহের সামনের দিকে যাওয়ার পথে দুপাশের শুক্রনালী দুটি পরস্পর কাছাকাছি এসে ক্ষেপণনালী (পরে দ্রষ্টব্য)-র সঙ্গে যুক্ত হয়। শুক্রাণু বহন করা শুক্রনালীর কাজ।




25 নং চিত্র— আরসোলার পুং-জনন-তন্ত্র।

শুক্রনালী যেখানে ক্ষেপণনালীর সঙ্গে মেশে, তার চারপাশে অনেকগুলি এক-মুখ-বন্ধ ছোট ছোট থলির

মতো অংশ ব্যাঙের ছাতার আকারে সাজানো থাকে। এইগুলিকে একসঙ্গে **ব্যাঙের ছাতা-আকার গ্রন্থি** বলে। এই গ্রন্থিতে শুক্রাণুগুলি সাময়িকভাবে জমা থাকে। এখানেই **স্পার্মাটোফোর** (Spermatophore) তৈরী হয়। কতকগুলি শুক্রাণু আবরণ দিয়ে বেষ্টিত হলে, শুক্রাণুর যে ছোট বাণ্ডিল তৈরী হয়, তাকে স্পার্মাটোফোর বলে।

**ক্ষেপণনালী** আসলে একটি পেশীময় নালী। এর মধ্য দিয়ে স্পার্মাটোফোর বাহিত হয়।

ক্ষেপণনালী একটি ছিদ্রপথে জনন-থলি(পরে দ্রষ্টব্য)-তে মুক্ত হয়। এই ছিদ্রটির **নাম পুং-জনন-ছিদ্র**। পুং-জনন-ছিদ্র দিয়ে স্পার্মাটোফোর বের হয়।

ব্যাঙের ছাতা-আকার গ্রন্থি ও ক্ষেপণনালীর নিচের দিকে একটি থলির মতো গ্রন্থি থাকে। এর নাম **কংগ্লোবেট** (Conglobate) **গ্রন্থি**। এটিও জনন-থলিতে মুক্ত হয় এবং স্পার্মাটোফোর তৈরীতে সাহায্য করে।

পুরুষ-আরসোলার নবম উদর-খণ্ডকে একটি থলির মতো অংশ থাকে। এরই নাম **জনন-থলি**। এর মধ্যে কুত্তিক-নির্মিত তিনটি পাত থাকে। এদের নাম **গোনাপোফাইসেস** (Gonapophyses) বা **ফ্যালোমিয়ার** (Phallomeres)। পুরুষ-আরসোলার জনন-ছিদ্র থেকে স্ত্রী-আরসোলার জনন-থলিতে স্পার্মাটোফোর স্থানান্তরিত করা এদের কাজ।

**স্ত্রী-জনন-তন্ত্র ঃ** স্ত্রী-আরসোলার জনন-তন্ত্রকে আরসোলার **স্ত্রী-জনন-তন্ত্র** বলে। একজোড়া **ডিম্বাশয়**-ই আরসোলার স্ত্রী-জনন-তন্ত্রের প্রধান অঙ্গ। এর, দ্বিতীয় থেকে ষষ্ঠ উদর-খণ্ডকে, পৌষ্টিক নালীর দুপাশে থাকে। প্রতিটি ডিম্বাশয় আবার আটটি লম্বাটে **ডিম্বাশয়-নালিকা** দিয়ে তৈরী। **ডিম্বাণু সৃষ্টি** করা ডিম্বাশয়ের কাজ।

প্রতিটি ডিম্বাশয়ের ডিম্বাশয়-নালিকাগুলির শেষ অংশ ডিম্বনালী নামের একটি পেশীময় নালীতে মেশে। দুপাশের ডিম্বনালী দুটি সপ্তম উদর-খণ্ডকে পরস্পরের কাছাকাছি এসে, একসঙ্গে মিলে একটি

**সাধারণ ডিম্বনালী** তৈরি করে। এই নালী পিছনদিকে **যোনি** নামের আর একটি বড় নালীর সঙ্গে মেশে। ডিম্বনালী, সাধারণ ডিম্বনালী এবং যোনির মধ্য দিয়ে ডিম্বাণু বাহিত হয়। যোনি সপ্তম উদর-খণ্ডকে অবস্থিত একটি ছিদ্র দিয়ে জনন-থলি(পরে দ্রষ্টব্য)-তে যুক্ত হয়। এই ছিদ্রের নাম স্ত্রী-**জনন-ছিদ্র**। স্ত্রী-জনন-ছিদ্র দিয়ে নিষিক্ত ডিম্ব বের হয়। সাধারণ ডিম্বনালী এবং যোনির সংযোগ-স্থলের কাছাকাছি




26 নং চিত্র— আরসোলার স্ত্রী-জনন-তন্ত্র।

অঞ্চলে দুটি অসমান (বাঁদিকেরটি থলির মতো, ডানদিকেরটি সরু ও প্যাঁচালো) **শুক্রধানী** থাকে। এরা একটি সাধারণ নালীপথে অষ্টম উদর-খণ্ডকে অবস্থিত একটি ছিদ্র দিয়ে জনন-থলির সঙ্গে যুক্ত হয়। পুরুষ-আরসোলার কাছ থেকে পাওয়া স্পার্মাটোফোরের শুক্রাণু-গুলি বাঁদিকের শুক্রনালীর মধ্যে সাময়িকভাবে জমা থাকে।

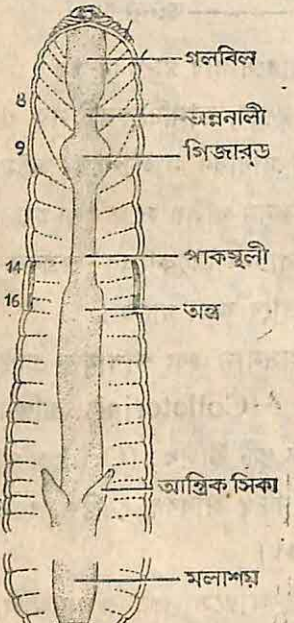
সপ্তম থেকে দশম উদর-খণ্ডকে দুটি অসমান এবং শাখাযুক্ত গ্রন্থি থাকে। এদের নাম **কোলেটেরিয়াল** (Colleterial) **গ্রন্থি**। এরা-ও জনন-থলিতে যুক্ত হয়। এই গ্রন্থি দুটি **উথিকা** (Ootheca) তৈরি করে। দুসারিতে সাজানো ষোলটি ডিম্ব আবরণ বেষ্টিত হয়ে যে চ্যাপ্টা থলি তৈরী হয়, তার নাম উথিকা।

সপ্তম, অষ্টম ও নবম উদর-খণ্ডকে স্ত্রী-আরসোলার **জনন-থলি**, এবং জনন-থলির মধ্যে তিন জোড়া **গোনাপোফাইসেস** থাকে। উথিকা ধারণ করা গোনাপোফাইসেসের কাজ। সপ্তম উদর-খণ্ডকের নিচের দিকে অবস্থিত একটি ছিদ্র দিয়ে উথিকা দেহের বাইরে আসে।

**কেঁচোর অঙ্গতন্ত্র ঃ** কেঁচো অঙ্গুরীমাল প্রাণী। নিচের কয়েকটি অনুচ্ছেদে এর পুষ্টিতন্ত্র, রক্ত-সংবহনতন্ত্র, নার্ভ-তন্ত্র এবং জনন-তন্ত্রের সাধারণ বর্ণনা দেওয়া হল।

**পুষ্টিতন্ত্র ঃ** পৌষ্টিক নালী এবং লালা-গ্রন্থি কেঁচোর পুষ্টিতন্ত্রের প্রধান অংশ।

**পৌষ্টিক নালী ঃ** কেঁচোর পৌষ্টিক নালী সোজা নলের মতো এবং দেহের সামনের দিকে অবস্থিত মুখ থেকে আরম্ভ করে, দেহের শেষ প্রান্তে অবস্থিত পায়ু পর্যন্ত বিস্তৃত। কেঁচোর **মুখ** অর্ধ-চন্দ্রাকার ছিদ্রের মতো এবং প্রথম দেহ-খণ্ডকের সামনের প্রান্তে অবস্থিত। খাদ্য গ্রহণ করা এর কাজ। প্রথম দেহ-খণ্ডকের সামনের অংশের উপরের দিক থেকে একখণ্ড ছোট মাংসের মতো অংশ ঝুলতে দেখা যায়। এর নাম **প্রোস্টোমিয়াম** (Prostomium)। খাদ্যগ্রহণে সাহায্য করা এর কাজ। মুখের ঠিক পিছন থেকে তৃতীয় দেহ-খণ্ডকের মাঝামাঝি পর্যন্ত যে সঙ্কোচী প্রকোষ্ঠ থাকে, তার নাম **মুখ-বিবর**। খাদ্যগ্রহণে সাহায্য করা এর কাজ। মুখ-বিবরের পরে পৌষ্টিক নালীর যে অংশ চতুর্থ দেহ-খণ্ডক পর্যন্ত বিস্তৃত এবং নাশপাতি আকারের, তার নাম **গলবিল**। এখানে খাদ্যের আংশিক পরিপাক হয়।



27 নং চিত্র— কেঁচোর পৌষ্টিক নালী।

পঞ্চম থেকে নবম দেহ-খণ্ডক পর্যন্ত বিস্তৃত পৌষ্টিক নালীর অংশের নাম **অন্ন-নালী**। অষ্টম ও নবম দেহ-খণ্ডকে অন্ননালী একটি পেশীময় ডিম্বাকার চর্বণ-যন্ত্র সৃষ্টি করে। এর নাম **গিজার্ড** (Gizzard)। গিজার্ডের ভিতরের আবরণ শক্ত। খাদ্য পেষণ করা গিজার্ডের কাজ।

গিজার্ডের পর থেকে শুরু করে, চতুর্দশ দেহ-খণ্ডক পর্যন্ত বিস্তৃত অংশকে **পাকস্থলী** বলে। এখানে খাদ্য পরিপাক হয়।

পঞ্চদশ দেহ-খণ্ডক থেকে পায়ু পর্যন্ত বিস্তৃত পৌষ্টিক নালীর অংশকে সাধারণভাবে **অন্ত্র** বলা হয়। ছাব্বিশ-সংখ্যক দেহ-খণ্ডকে, অন্ত্রের দুপাশ থেকে দুটি ছোট লম্বাটে মাংসপিণ্ড উৎপন্ন হয়। এদের নাম **আন্ত্রিক সিকা** (Caeca)। পাচক রস নিঃসরণ করা আন্ত্রিক সিকার কাজ। আন্ত্রিক সিকার উৎপত্তি-স্থল পর্যন্ত অন্ত্রের যে অংশ, তার মধ্যে খাদ্য পরিপাক ও শোষণ হয়। শেষ পঁচিশটি অথবা তেইশটি দেহ-খণ্ডক জুড়ে অন্ত্রের যে অংশ থাকে, তাতে মল জমা থাকে। সেইজন্য, এই অংশের নাম **মলাশয়।** আন্ত্রিক সিকার পর থেকে মলাশয়ের আগে পর্যন্ত অন্ত্রের যে অংশ, তার প্রাকারের ভিতরের তলে একটি উল্লম্ব ভাঁজ থাকে। এই ভাঁজটির নাম **টিফ্‌লোসোল** (Typhlosole)। অন্ত্রের এই অংশে খাদ্য শোষিত হয়।

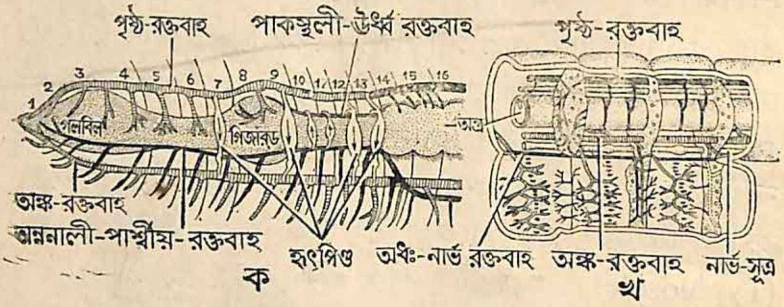
শেষ দেহ-খণ্ডকের পিছনদিকে যে উপবৃত্তাকার ছিদ্র থাকে, তার-ই নাম **পায়ু**। পায়ু দিয়ে মল বের হয়।

**লালা-গ্রন্থি ঃ** গলবিলের পৃষ্ঠদেশে কতকগুলি গ্রন্থি-কোষ মিলে **লালা-গ্রন্থি** বা **গলবিল-কন্দ** সৃষ্টি করে। এই গ্রন্থি-নিঃসৃত লালা কতকগুলি নালিকার মধ্য দিয়ে গলবিলের গহ্বরে পৌঁছায়। লালায় শ্লেষ্মা এবং প্রোটীন-পরিপাককারী উৎসেচক থাকে। খাদ্য পরিপাক করা এর প্রধান কাজ।

**রক্ত-সংবহন-তন্ত্র ঃ** দেহের লম্বা অক্ষ-বরাবর বিন্যস্ত তিনটি রক্তবাহ কেঁচোর রক্ত-সংবহন-তন্ত্রের প্রধান অংশ। এছাড়া, অসংখ্য সরু ও মোটা অনুপ্রস্থ রক্তবাহ এই তিনটি অনুদৈর্ঘ্য রক্তবাহর সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে। অনুপ্রস্থ রক্তবাহগুলির কয়েকটি সঙ্কোচী। এরা কতকটা হৃৎপিণ্ডের মতো কাজ করে।

অনুদৈর্ঘ্য রক্তবাহর মধ্যে যেটি সবচেয়ে মোটা এবং পৌষ্টিক নালীর উপরে মধ্যরেখা-বরাবর থাকে, তার নাম **পৃষ্ঠ-রক্তবাহ**। এই রক্তবাহর মধ্য দিয়ে পিছনের দিক থেকে সামনের দিকে রক্ত

প্রবাহিত হয়। অন্ত্র-অঞ্চলের, অর্থাৎ চতুর্দশ দেহ-খণ্ডক থেকে শেষ দেহ-খণ্ডক পর্যন্ত অঞ্চলের প্রতি দেহ-খণ্ডকে, অন্ত্রের উপরের দিক থেকে একজোড়া ছোট রক্তবাহ, এবং রেচন-অঙ্গ ও দেহ-প্রাকার থেকে আর একটি শাখাযুক্ত রক্তবাহ পৃষ্ঠ-রক্তবাহর সঙ্গে এসে মেশে। অর্থাৎ, অন্ত্র-অঞ্চলে রক্ত সংগ্রহ করা পৃষ্ঠ-রক্তবাহর কাজ। প্রথম দেহ-খণ্ডক থেকে ত্রয়োদশ দেহ-খণ্ডক পর্যন্ত অঞ্চলে এই রক্তবাহর




28 নং চিত্র— কেঁচোর রক্ত-সংবহন-তন্ত্র : ক. সামনের দিকের, এবং খ. পিছনদিকের রক্তবাহগুলির বিন্যাস-ব্যবস্থা।

কাজ রক্ত সরবরাহ করা। কয়েকটি শাখা-রক্তবাহর সাহায্যে এই রক্তবাহ এই অঞ্চলে অবস্থিত পৌষ্টিক নালীর বিভিন্ন অংশে রক্ত সরবরাহ করে। এছাড়া, পৃষ্ঠ-রক্তবাহ সপ্তম, নবম, দ্বাদশ এবং ত্রয়োদশ— এই চারটি দেহ-খণ্ডকে অবস্থিত চার জোড়া মোটা ও সঙ্কোচী রক্তবাহতেও রক্ত সরবরাহ করে। এই মোটা ও সঙ্কোচী রক্তবাহগুলিকে **হৃৎপিণ্ড** বলে।

পৌষ্টিক নালীর নিচে, মধ্যরেখা-বরাবর যে অনুদৈর্ঘ্য রক্তবাহ থাকে, তার নাম **অঙ্ক-রক্তবাহ**। অন্ত্র-অঞ্চলে এই রক্তবাহর মধ্য দিয়ে সামনের দিক থেকে পিছনের দিকে রক্ত বাহিত হয়। এই রক্তবাহ থেকে উৎপন্ন শাখা-রক্তবাহ অন্ত্র-অঞ্চলের দেহ-প্রাকার, রেচন-অঙ্গ এবং পৌষ্টিক নালীতে রক্ত সরবরাহ করে। চতুর্দশ দেহ-খণ্ডকের আগের অঞ্চলে অঙ্ক-রক্তবাহর মধ্য দিয়ে রক্ত পিছনদিক

থেকে সামনের দিকে প্রবাহিত হয়। চারজোড়া হৃৎপিণ্ডের মাধ্যমে এই রক্তবাহ পৃষ্ঠ-রক্তবাহ থেকে রক্তের সরবরাহ পায়।

তৃতীয় অনুদৈর্ঘ্য রক্তবাহটি কিছুটা সরু এবং অঙ্কীয় নার্ভ-সূত্রের ঠিক নিচ-বরাবর থাকে। এর নাম **অধঃ-নার্ভ রক্তবাহ**। অন্ত্র-অঞ্চলে এই রক্তবাহ প্রতি দেহ-খণ্ডকে একজোড়া শাখার সাহায্যে অঙ্কীয় দেহ-প্রাকার এবং অঙ্কীয় নার্ভ-সূত্র থেকে রক্ত সংগ্রহ করে। শাখা-রক্তবাহর সাহায্যে এই রক্তবাহর সঙ্গে পৃষ্ঠ-রক্তবাহর যোগাযোগ আছে। ত্রয়োদশ দেহ-খণ্ডক থেকে প্রথম দেহ-খণ্ডক পর্যন্ত অঞ্চলে, অধঃ-নার্ভ রক্তবাহ দুটি শাখায় বিভক্ত হয়ে পৌষ্টিক নালীর দুপাশ-বরাবর বিন্যস্ত থাকে। তখন এদের নাম **অন্ননালী-পার্শ্বীয় রক্তবাহ**। এই অঞ্চলের অঙ্কদেশ থেকে রক্ত সংগ্রহ করা এই রক্তবাহ দুটির কাজ।

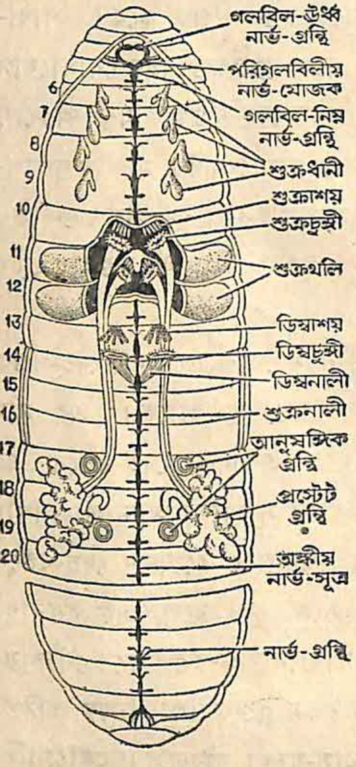
পাকস্থলীর পৃষ্ঠ-মধ্যরেখা-বরাবর, নবম থেকে ত্রয়োদশ দেহ-খণ্ডক পর্যন্ত বিস্তৃত, আরও একটি ছোট ও সরু রক্তবাহ আছে। এর নাম **পাকস্থলী-ঊর্ধ্ব রক্তবাহ**। দশম এবং একাদশ দেহ-খণ্ডকে এই রক্তবাহ দুজোড়া ফাঁসের মতো রক্তবাহর সাহায্যে অন্ননালী-পার্শ্বীয় রক্তবাহ দুটি থেকে রক্ত সংগ্রহ করে। দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ দেহ-খণ্ডকে এই রক্তবাহটি হৃৎপিণ্ড দুজোড়ার সঙ্গে যুক্ত বলে, এই রক্তবাহর সংগৃহীত রক্ত ঐ দুজোড়া হৃৎপিণ্ডের মাধ্যমে অঙ্ক-রক্তবাহতে পৌঁছায়।

কেঁচোর **রক্ত** রক্তরস এবং কয়েক রকম রক্তকণিকা নিয়ে গঠিত। রক্তকণিকাগুলি বর্ণহীন এবং নিউক্লিয়াস-যুক্ত। রক্তরসে **হিমোগ্লোবিন** (Haemoglobin) নামের লাল রঙের শ্বাস-কণা থাকে বলে, কেঁচোর রক্তের রঙ **লাল**।

**নার্ভ-তন্ত্র ঃ** দেহের অঙ্ক-মধ্যরেখা-বরাবর বিন্যস্ত সুতার মতো অঙ্কীয় **নার্ভ-সূত্র**-ই কেঁচোর নার্ভ-তন্ত্রের প্রধান অংশ (29 নং চিত্র)। এটি পঞ্চম দেহ-খণ্ডক থেকে শেষ দেহ-খণ্ডক পর্যন্ত বিস্তৃত। প্রতি দেহ-খণ্ডকে, অঙ্কীয় নার্ভ-সূত্রে একটি করে ফোলা অংশ দেখা যায়। ঐখানে পাশাপাশি অবস্থিত দুটি নার্ভ-গ্রন্থি থাকে। নার্ভ-সূত্রটিও খুব

কাছাকাছি অবস্থিত ছুটি অনুদৈর্ঘ্য নার্ভ-সূত্র নিয়ে গঠিত। প্রতি দেহ-খণ্ডকের নার্ভ-গ্রন্থি ছুটি থেকে ছুজোড়া নার্ভ উৎপন্ন হয়ে দেহ-প্রাকার এবং অন্যান্য অংশে চলে যায়।

তৃতীয় ও চতুর্থ দেহ-খণ্ডকে (অর্থাৎ, অঙ্কীয় নার্ভ-সূত্রের শীর্ষদেশে) নার্ভ-কলা দিয়ে তৈরী একটি আংটির মতো অংশ থাকে। একে কেঁচোর **নার্ভ-অঙ্গুরী** বলে। ছুজোড়া নার্ভ-গ্রন্থি এবং একজোড়া নার্ভ-যোজক দিয়ে নার্ভ-অঙ্গুরী তৈরী হয়। এদের মধ্যে প্রথম জোড়া নার্ভ-গ্রন্থির নাম **গলবিল-উর্ধ্ব নার্ভ-গ্রন্থি**। এরা পৌষ্টিক নালীর পৃষ্ঠদেশে মুখ-বিবর ও গল-বিলের মাঝামাঝি জায়গায় পাশা-পাশি থাকে। এই নার্ভ-গ্রন্থি ছুটিকে **মস্তিষ্ক**-ও বলা হয়। দ্বিতীয় জোড়া নার্ভ-গ্রন্থি চতুর্থ দেহ-খণ্ডকে, গলবিলের নিচে পাশা-পাশি থাকে। এদের নাম **গলবিল-নিম্ন নার্ভ-গ্রন্থি**। নার্ভ-যোজক ছুটির নাম **পরি-গলবিলীয় নার্ভ যোজক**। এরা গলবিল-উর্ধ্ব নার্ভ-গ্রন্থি থেকে উৎপন্ন হয়ে, গলবিল-নিম্ন নার্ভ-গ্রন্থির সঙ্গে যুক্ত হয়। নার্ভ-অঙ্গুরী থেকে অনেকগুলি সূক্ষ্ম নার্ভ উৎপন্ন হয়ে, প্রথম থেকে চতুর্থ দেহ-খণ্ডকের বিভিন্ন অংশে চলে যায়।




29 নং চিত্র— কেঁচোর নার্ভ-তন্ত্র এবং জনন-তন্ত্র।

<u>জনন-তন্ত্র</u> : কেঁচো **উভলিঙ্গ** বা **দ্বিলিঙ্গ** প্রাণী, অর্থাৎ এদের স্ত্রী-পুরুষ-ভেদ নেই ; একই প্রাণীর দেহে পুং-জনন-অঙ্গ এবং স্ত্রী-জনন-অঙ্গ ছুই-ই থাকে।

**পুং-জনন-অঙ্গ** ঃ দুজোড়া শুক্রাশয় কেঁচোর প্রধান পুং-জনন-অঙ্গ। এরা দশম ও একাদশ দেহ-খণ্ডকে, অঙ্কীয় নার্ভ-সূত্রের দুপাশে থাকে। প্রতিটি শুক্রাশয় পাঁচটি থেকে নটি সূক্ষ্ম আঙুলের মতো অংশ দিয়ে তৈরী। এক-এক জোড়া শুক্রাশয় এক-একটি **শুক্রাশয়-থলি** নামের থলির মধ্যে থাকে। শুক্রাণু তৈরি করা শুক্রাশয়ের কাজ। একাদশ ও দ্বাদশ দেহ-খণ্ডকে আরও দুজোড়া থলির মতো অংশ থাকে। এদের নাম **শুক্রথলি**। এদের মধ্যে একরকম রস থাকে। সেই রসের সাহায্যে শুক্রাণুরা পুষ্ট হয়।

চারটি শুক্রাশয়ের কাছে চারটি ছোট চোঙার মতো **শুক্রচুঙ্গী** থাকে। এদের পিছনদিক থেকে একটি করে সরু নলের মতো **শুক্র-নালী** উৎপন্ন হয়ে, অষ্টাদশ দেহ-খণ্ডক পর্যন্ত চলে যায়। শুক্রচুঙ্গী এবং শুক্রনালীর মধ্য দিয়ে শুক্রাণু বাহিত হয়।

ষোলো-সংখ্যক অথবা সতেরো-সংখ্যক দেহ-খণ্ডক থেকে কুড়ি-সংখ্যক অথবা একুশ-সংখ্যক দেহ-খণ্ডক পর্যন্ত অংশে, পৌষ্টিক নালীর দুপাশে সাদা এবং অসমান পরিধির দুটি গ্রন্থি থাকে। এদের নাম **প্রস্টেট** (Prostate) **গ্রন্থি**। কোনও পাশের প্রস্টেট গ্রন্থির নালী সেই পাশের শুক্রনালী দুটির পাশাপাশি থেকে এবং একটি সাধারণ আবরণ দিয়ে বেষ্টিত হয়ে, আঠারো-সংখ্যক দেহ-খণ্ডকের নিচের তলে অবস্থিত একটি ছিদ্রের সাহায্যে দেহের বাইরে মুক্ত হয়। অঙ্ক-মধ্য-রেখার দুপাশে অবস্থিত এই ছিদ্র দুটির নাম **পুং-জনন-ছিদ্র**। এরা অর্ধ-চন্দ্রাকার, এবং গোল গোল উঁচু জায়গার উপরে থাকে। পুং-জনন-ছিদ্র দিয়ে শুক্রাণু দেহের বাইরে আসে।

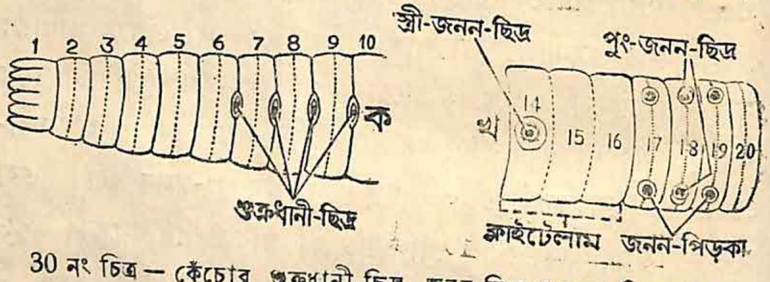
সতেরো এবং উনিশ-সংখ্যক দেহ-খণ্ডকের নার্ভ-সূত্রের দুপাশে দুটি করে মোট চারটি ছোট ও গোল গোল গ্রন্থি থাকে। এদের নাম **আনুষঙ্গিক গ্রন্থি**। এই গ্রন্থি চারটি-বরাবর, দেহ-প্রাকারের বাইরের তলে চারটি গোল গোল উঁচু জায়গা দেখা যায়। এদের **জনন-পিড়কা** বলে। এরা যৌন-সঙ্গমে সাহায্য করে।

**স্ত্রী-জনন-অঙ্গ** ঃ তেরো-সংখ্যক দেহ-খণ্ডকের অঙ্ক-মধ্যরেখার

দুপাশে অবস্থিত দুটি **ডিম্বাশয়** কেঁচোর প্রধান স্ত্রী-জনন-অঙ্গ। এগুলিও কয়েকটি করে ছোট ছোট আঙুলের মতো সাদা অংশ নিয়ে গঠিত। ডিম্বাশয়ে ডিম্বাণু সৃষ্টি হয়।

প্রতিটি ডিম্বাশয়ের ঠিক পিছনে একটি করে ছোট চোঙার মতো অংশ থাকে। এদের নাম **ডিম্বচুঙ্গী**। ডিম্বচুঙ্গী দুটি পিছনের দিকে ক্রমে সরু হয়ে দুটি ছোট **ডিম্বনালী** সৃষ্টি করে। চোদ্দ-সংখ্যক দেহ-খণ্ডকে, দুপাশের ডিম্বনালী দুটি মাঝখানে এসে একসঙ্গে মিলিত হয় এবং ঐ দেহ-খণ্ডকের অঙ্ক-মধ্যরেখায় অবস্থিত একটি গোল ছিদ্রের সাহায্যে দেহের বাইরে মুক্ত হয়। এই ছিদ্রের নাম **স্ত্রী-জনন-ছিদ্র**। ডিম্বচুঙ্গী, ডিম্বনালী এবং স্ত্রী-জনন-ছিদ্রের মধ্য দিয়ে ডিম্বাণু দেহের বাইরে আসে।

ষষ্ঠ থেকে নবম দেহ-খণ্ডকের প্রত্যেকটিতে একজোড়া করে মোট চারজোড়া নাশপাতি-আকার ছোট থলির মতো অংশ থাকে। এদের নাম **শুক্রধানী**। এরা অঙ্ক-মধ্যরেখার দুপাশে সাজানো থাকে। এই দেহ-খণ্ডকগুলির মধ্যবর্তী খাঁজের অঙ্কদেশের দুপাশে




30 নং চিত্র — কেঁচোর শুক্রধানী-ছিদ্র, জনন-ছিদ্র ও জনন-পিড়কার অবস্থান : ক. সামনের অংশ (পার্শ্বদৃশ্য) ; খ. মাঝের অংশ (অঙ্কদৃশ্য)।

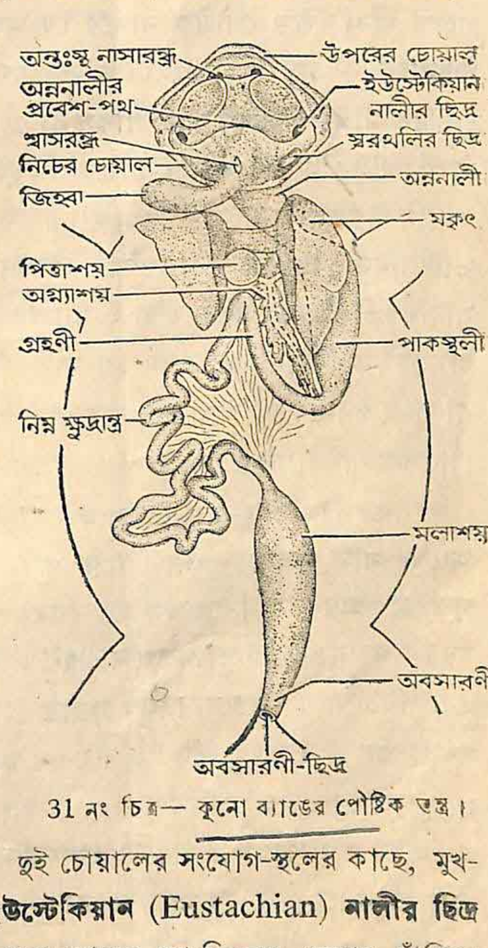
চারজোড়া উপবৃত্তাকার ছিদ্র দেখা যায়। এইগুলির নাম **শুক্রধানী-ছিদ্র**। যৌন-সঙ্গমের সময় অন্য কেঁচোর দেহ থেকে নিঃসৃত শুক্রাণুগুলি শুক্রধানী-ছিদ্রের মধ্য দিয়ে প্রবেশ করে, শুক্রধানীর মধ্যে যায় এবং সেখানে সাময়িকভাবে জমা থাকে।

**কুনো ব্যাঙের অঙ্গতন্ত্র ঃ** কুনো ব্যাঙ উভচর শ্রেণীর মেরুদণ্ডী প্রাণী। পরের কয়েকটি অনুচ্ছেদে এর প্রধান কয়েকটি অঙ্গতন্ত্র,

যেমন— পুষ্টিতন্ত্র, শ্বসন-তন্ত্র, রক্ত-সংবহন-তন্ত্র, রেচন-তন্ত্র, নার্ভ-তন্ত্র এবং কঙ্কাল-তন্ত্র সম্বন্ধে মোটামুটি ধারণা দেওয়া হল।

**পুষ্টিতন্ত্র ঃ** কুনো ব্যাঙের পুষ্টিতন্ত্র পৌষ্টিক নালী এবং পৌষ্টিক গ্রন্থি নিয়ে গঠিত।

**পৌষ্টিক নালী ঃ** কুনো ব্যাঙের পৌষ্টিক নালী দেহের সামনের প্রান্তে অবস্থিত মুখ থেকে শুরু করে, দেহের শেষ প্রান্তে অবস্থিত অবসারণী-ছিদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত এবং লম্বা নলের মতো। **মুখ** বেশ বড়। এর উপরে ও নিচে যথাক্রমে **উপরের চোয়াল** ও **নিচের চোয়াল** থাকে। এদের চোয়ালে দাঁত নেই। খাদ্যগ্রহণ করা মুখের কাজ। মুখের পিছনে একটি বড় প্রকোষ্ঠ থাকে। একে **মুখ-বিবর** বলে। মুখ-বিবরে কয়েকটি ছোট-বড় ছিদ্র থাকে। যেমন— মুখ-বিবরের ছাদের সামনের দিকে পাশাপাশি থাকে দুটি ছোট **অন্তঃস্থ নাসারন্ধ্র**। দুই চোয়ালের সংযোগ-স্থলের কাছে, মুখ-বিবরের দুপাশে দুটি **ইউস্টেকিয়ান** (Eustachian) **নালীর ছিদ্র** থাকে। কেবল পুরুষ-কোলা ব্যাঙের মুখ-বিবরের মেঝের বাঁদিকে একটি ছিদ্র থাকে। এর নাম **স্বরথলির ছিদ্র**। মুখ-বিবরের মেঝেয় একটি মাংসল **জিহ্বা** থাকে। জিহ্বার মুক্ত-প্রান্ত ভিতরের দিকে




31 নং চিত্র— কুনো ব্যাঙের পৌষ্টিক তন্ত্র।

থাকে। মানুষের জিহ্বার মুক্ত-প্রান্ত বাইরের দিকে থাকে। জিহ্বার সাহায্যে ব্যাঙ খাদ্য শিকার করে। মুখ-বিবরের শেষভাগকে **গলবিল** বলা হয়। এর কেন্দ্রে একটি বড় আড়াআড়ি ছিদ্র দেখা যায়। এটি **অন্ননালীর প্রবেশ-পথ**। জিহ্বার গোড়ায় যে ছোট ছিদ্রটি থাকে, তার নাম **শ্বাসরন্ধ্র**।

মুখে গৃহীত খাদ্য মুখ-বিবর, গলবিল এবং অন্ননালীর প্রবেশ-পথের মধ্যে দিয়ে পৌষ্টিক নালীর যে অংশে পৌঁছায়, তার নাম **অন্ননালী**। এটি বেঁটে ও মোটা নলের মতো। এর মধ্য দিয়ে খাদ্য পৌষ্টিক নালীর পরবর্তী অংশ **পাকস্থলী**-তে যায়। পাকস্থলী অল্প বাঁকা থলির মতো এবং দেহ-গহ্বরের কিছুটা বাঁদিক ঘেঁষে থাকে। এখানে খাদ্যের আংশিক পরিপাক হয়। জল, খনিজ লবণ এবং ভাইটামিন সরাসরি পাকস্থলীর প্রাকারে শোষিত হয়। খাদ্য সাময়িকভাবে জমা করে রাখা-ও ব্যাঙের পাকস্থলীর অন্য কাজ। ব্যাঙের মুখ-বিবরে খাদ্য হজম হয় না। কিন্তু, মানুষের মুখ-বিবরে লালা-গ্রন্থি-নিঃসৃত লালার সাহায্যে শ্বেতসার-জাতীয় খাদ্যের আংশিক পরিপাক হয়।

পাকস্থলীর শেষ-প্রান্তের সঙ্গে জোড়া, খুব লম্বা নলের মতো অংশের নাম **ক্ষুদ্রান্ত্র**। এর আবার দুটি ভাগ। পাকস্থলী এবং ক্ষুদ্রান্ত্রের প্রথমভাগ মিলে কতকটা ইংরেজী 'U'-এর মতো দেখতে হয়। ক্ষুদ্রান্ত্রের এই ভাগের নাম **গ্রহণী**। ক্ষুদ্রান্ত্রের অন্য অংশ লম্বা এবং প্যাঁচালো। এর নাম **নিম্ন ক্ষুদ্রান্ত্র**। ক্ষুদ্রান্ত্রে খাদ্যের পরিপাক সম্পূর্ণ হয়। পরিপাকের পর খাদ্য-রস ক্ষুদ্রান্ত্রের প্রাকারে শোষিত হয়। ক্ষুদ্রান্ত্রের পরে পৌষ্টিক নালীর যে অংশ থাকে, তার নাম **বৃহদন্ত্র**। এর প্রথম অংশ বেশি মোটা এবং **মলাশয়** নামে পরিচিত। এখানেও কিছু পরিমাণে খাদ্য-রস শোষিত হয়। খাদ্যের অপাচ্য অংশ মল হিসাবে সাময়িকভাবে জমা করে রাখা মলাশয়ের প্রধান কাজ। বৃহদন্ত্রের শেষ অংশ সরু। এর নাম **অবসারণী**। এর মধ্য দিয়ে মল, মূত্র এবং শুক্রাণু অথবা ডিম্বাণু বাহিত হয়ে, ধড়ের শেষ-প্রান্তে

অবস্থিত একটি বৃত্তাকার ছিদ্রের সাহায্যে দেহের বাইরে চলে আসে। এই ছিদ্রই **অবসারণী-ছিদ্র**।

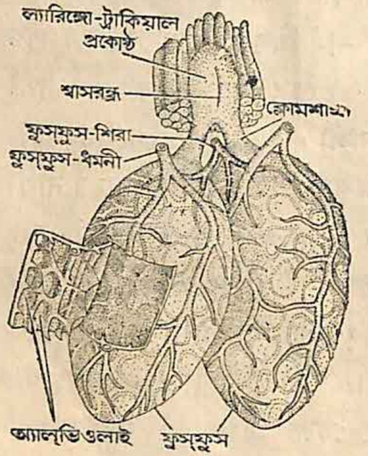
**পৌষ্টিক গ্রন্থি** : কুনো ব্যাঙের **যকৃৎ** এবং **অগ্ন্যাশয়** নামের দুটি বড় পৌষ্টিক গ্রন্থি আছে। যকৃৎ বাদামী রঙের এবং হৃৎপিণ্ডের কাছে থাকে। এর তিনটি অংশ : বাঁদিকের অংশটি ডানদিকেরটির চেয়ে বড়, মাঝের অংশটি দুপাশের অংশ দুটির মধ্যে যোগসাধন করে। যকৃতের মাঝের অংশের উপরে ঘন সবুজ রঙের মটর দানার মতো একটি থলি থাকে। এর নাম **পিত্তাশয়**। যকৃৎ একরকম ঘন সবুজ রঙের তিতো রস ক্ষরণ করে। এর নাম **পিত্ত**। সাময়িকভাবে পিত্ত জমা করে রাখা পিত্তাশয়ের কাজ। যকৃৎ থেকে কতকগুলি নালী উৎপন্ন হয়। এদের নাম **যকৃৎ-নালী**। পিত্তাশয় থেকেও নালী উৎপন্ন হয়। এদের নাম **পিত্তাশয় নালী**। এই দুই ধরনের নালী মিলে তৈরী হয় **সাধারণ পিত্তনালী**। সাধারণ পিত্তনালী অগ্ন্যাশয়ের ভিতর দিয়ে যাওয়ার সময়, অগ্ন্যাশয় থেকে উৎপন্ন কয়েকটি **অগ্ন্যাশয়-নালী**-র সঙ্গে যুক্ত হয়ে **যকৃৎ-অগ্ন্যাশয়-নালী** তৈরি করে। এই নালীটি গ্রহণীর গহ্বরে মুক্ত হয়। পিত্ত ক্ষারীয় তরল। স্নেহদ্রব্য ও তৈল-জাতীয় খাদ্যকে সূক্ষ্ম কণায় ভেঙে দেওয়া পিত্তের কাজ। যকৃতে গ্লাইকোজেন (Glycogen) এবং স্নেহদ্রব্য-জাতীয় খাদ্যও জমা থাকে। এছাড়া, যকৃতের আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ আছে।

পাকস্থলী ও গ্রহণীর মাঝখানে অগ্ন্যাশয় থাকে। এটি অনিয়মিত পরিধিযুক্ত, হাল্কা হলুদ রঙের এবং লম্বাটে। এর নিঃসৃত অগ্ন্যাশয়-রসে নানারকম উৎসেচক থাকে। এই উৎসেচকগুলির ক্রিয়ায় সব ধরনের খাদ্যের পরিপাক হয়।

**শ্বসন-তন্ত্র** : দেহ-গহ্বরের সামনের অংশে, হৃৎপিণ্ডের দুপাশে অবস্থিত দুটি ঈষদচ্ছ ও হাল্কা লাল রঙের থলির মতো **ফুস্ফুস** কুনো ব্যাঙের শ্বসন-তন্ত্রের প্রধান অঙ্গ। এরা খুব বেশি পরিমাণে সঙ্কুচিত ও প্রসারিত হতে পারে। ফুস্ফুসের প্রাকারের ভিতরের তলে অসম্পূর্ণভাবে বিভক্ত অসংখ্য ছোট ছোট গোলাকার কক্ষ থাকে।

এদের নাম **অ্যাল্ভিওলাই** (Alveoli)। অ্যাল্ভিওলাই-এর চারদিকে প্রচুর পরিমাণে রক্ত-জালক থাকে। শ্বসনের সময় অ্যাল্ভিওলাই-এর ভিতরের বায়ুর অক্সিজেন ব্যাপন (পরের পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য) প্রক্রিয়ায় রক্ত-জালকের ভিতরের রক্তে প্রবেশ করে এবং রক্ত-জালকের রক্ত থেকে কার্বন ডাই-অক্সাইড অ্যাল্ভিওলাই-এর বায়ুতে মেশে।

বাইরে থেকে বায়ুকে ফুস্ফুসের মধ্যে প্রবেশ করতে হলে, অথবা ফুস্ফুস থেকে দেহের বাইরে বায়ুকে বেরিয়ে যেতে হলে, একটি নির্দিষ্ট পথেই যেতে হয়। যেমন—মাথার সামনের প্রান্তে, উপরের চোয়ালের ঠিক উপরে, পৃষ্ঠ-মধ্যরেখার দুপাশে দুটি ছোট ও গোল ছিদ্র থাকে। এদের নাম **বহিঃস্থ নাসারন্ধ্র**। এরা বন্ধ হতে এবং খুলতে পারে। বাইরে থেকে বায়ুকে দেহের মধ্যে প্রবেশ করতে হলে, বহিঃস্থ নাসারন্ধ্র দুটির মধ্য দিয়ে আসতে হয়। বহিঃস্থ নাসারন্ধ্র দুটি করোটির মধ্য দিয়ে দুটি ছোট পথের সাহায্যে মুখ-বিবরের ছাদে অবস্থিত (আগে বর্ণিত) দুটি **অন্তঃস্থ নাসারন্ধ্র** নামের ছিদ্রের সঙ্গে যুক্ত। এই পথ দুটিকে **নাসাপথ** বলে। অতএব, বায়ু বহিঃস্থ নাসারন্ধ্র, নাসাপথ এবং অন্তঃস্থ নাসারন্ধ্রের মধ্য দিয়ে **মুখ-বিবর** এবং **গলবিল**-এ প্রবেশ করে। এখান থেকে বায়ু জিহ্বার গোড়ায় অবস্থিত **শ্বাসরন্ধ্র** নামের একটি ছোট ছিদ্রের মধ্য দিয়ে **ল্যারিঙ্গো-ট্রাকিয়াল** (Laryngo-tracheal) **প্রকোষ্ঠ** নামের একটি ছোট প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করে। এই প্রকোষ্ঠ মুখ-বিবরের নিচের দিকে থাকে। এর মধ্যে সুতার মতো দুটি **স্বরতন্ত্রী** আছে। ল্যারিঙ্গো-ট্রাকিয়াল প্রকোষ্ঠ থেকে দুটি ছোট সরু নল বের হয়। এদের নাম **ক্লোমশাখা**। প্রতিটি ক্লোমশাখার




32 নং চিত্র— কুনো ব্যাঙের শ্বসন-তন্ত্র (একটি ফুস্ফুস আংশিক কাটা)।

অন্য প্রান্তে একটি করে ফুস্‌ফুস থাকে। সুতরাং, বহিঃস্থ নাসারন্ধ্র, মুখ-বিবর, গলবিল, শ্বাসরন্ধ্র, ল্যারিঙ্গো-ট্রাকিয়াল প্রকোষ্ঠ এবং ক্লোম-শাখা— এই পথে বাইরে থেকে বায়ু ফুস্‌ফুসে প্রবেশ করে ; আবার, এরই বিপরীত পথে বায়ু ফুস্‌ফুস থেকে দেহের বাইরে চলে যায়। শ্বসনে সাহায্য করায়, এই অঙ্গগুলিকে **আনুষঙ্গিক শ্বাস-অঙ্গ** বলে।

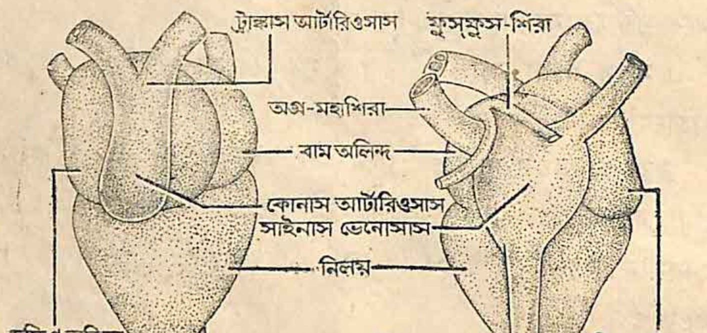
ল্যারিঙ্গো-ট্রাকিয়াল প্রকোষ্ঠের বদলে মানুষের থাকে বাগ্‌যন্ত্র এবং বাগ্‌যন্ত্রের শেষপ্রান্তে যুক্ত লম্বা **ক্লোমনালিকা** ; ক্লোমনালিকা থেকে দুটি ক্লোমশাখা উৎপন্ন হয়।

ফুস্‌ফুস ছাড়া, ব্যাঙ গলবিল ও মুখ-বিবরের শ্লেষ্মঝিল্লী এবং চর্মের সাহায্যে কম-বেশি শ্বসন করতে পারে।

**রক্ত-সংবহন-তন্ত্র :** কুনো ব্যাঙের রক্ত-সংবহন-তন্ত্র হৃৎপিণ্ড, সারা দেহে ছড়িয়ে থাকা ছোট-বড় রক্তবাহ এবং রক্তবাহগুলির মধ্যে প্রবহমান রক্ত নিয়ে গঠিত। নিচে এদের সম্বন্ধে প্রাথমিক ধারণা দেওয়া হল।

**হৃৎপিণ্ড :** দেহ-গহ্বরের সামনের অংশে, বুকের অঙ্কভাগের মধ্যরেখা-বরাবর কুনো ব্যাঙের হৃৎপিণ্ড থাকে। হৃৎপিণ্ডটি মোটামুটি শাঙ্কব এবং মোট **পাঁচটি** প্রকোষ্ঠ নিয়ে গঠিত। এর সুচালো দিক দেহের পিছনের দিকে থাকে। প্রকোষ্ঠ পাঁচটির নাম **বাম অলিন্দ, দক্ষিণ অলিন্দ, নিলয়, সাইনাস ভেনোসাস** (Sinus venosus) এবং **কোনাস আর্টারিওসাস** (Conus arteriosus)। মানুষের হৃৎপিণ্ডে দুটি অলিন্দ এবং দুটি নিলয়— মোট চারটি প্রকোষ্ঠ আছে। ব্যাঙের অলিন্দ দুটি হৃৎপিণ্ডের চওড়া দিকে পাশাপাশি থাকে। **ইন্টার্-অরিক্যুলার সেপ্‌টাম** (Inter-auricular septum) নামের দুটি পর্দা দিয়ে অলিন্দ দুটি পরস্পর পৃথক থাকে। দক্ষিণ অলিন্দটি বাম অলিন্দের চেয়ে কিছুটা বড়। অলিন্দ দুটির পিছনের দিকে থাকে নিলয়। এর প্রাকার খুব পুরু ও পেশীময় এবং গহ্বর খুব ছোট। অলিন্দ দুটি একটি সাধারণ ছিদ্রের সাহায্যে নিলয়ের সঙ্গে যুক্ত। এই ছিদ্রটির নাম **অরিক্যুলো-ভেন্‌ট্রিক্যুলার** (Auriculo-ventricular) ছিদ্র।

এই ছিদ্রের মুখে একজোড়া কপাটক থাকে। এদের নাম **অরিক্যুলো-ভেন্‌ট্রিকুলার কপাটক**। হৃৎপিণ্ডের পৃষ্ঠদেশে তুটি অগ্র-মহাশিরা এবং একটি পশ্চাৎ-মহাশিরা মিলে যে তিন-কোণা থলির মতো অংশ গঠন করে, তার-ই নাম সাইনাস ভেনোসাস। **সাইনু-অরিক্যুলার** (Sinu-auricular) **ছিদ্র** নামের একটি ডিম্বাকার ছিদ্রের সাহায্যে সাইনাস ভেনোসাস দক্ষিণ অলিন্দের সঙ্গে যুক্ত। এই ছিদ্রপথে **সাইনু-অরিক্যুলার কপাটক** নামের একজোড়া কপাটক থাকে। বাম অলিন্দের

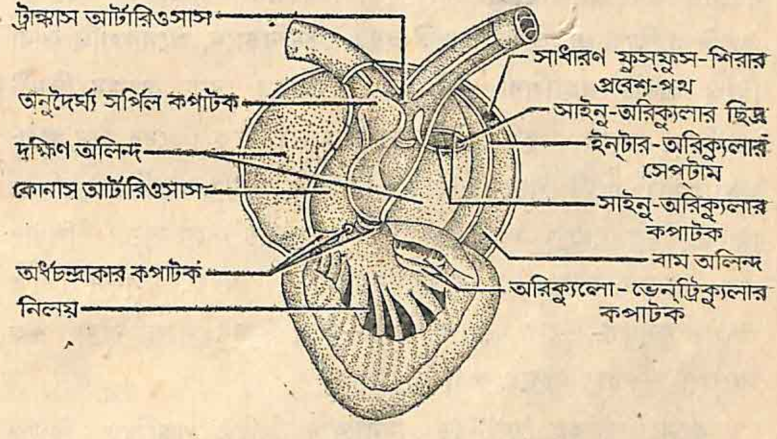



33 নং চিত্র— কুনো ব্যাঙের হৃৎপিণ্ড : ক. অঙ্কদৃশ্য ; খ. পৃষ্ঠদৃশ্য।

প্রাকারেও একটি ছিদ্র থাকে। এই ছিদ্রপথে সাধারণ ফুস্‌ফুস-শিরা বাম অলিন্দের সঙ্গে যুক্ত। নিলয়ের সামনের অংশের অঙ্কভাগের ডান পাশ থেকে যে নলাকার প্রকোষ্ঠ উৎপন্ন হয় এবং অলিন্দ-তুটির অঙ্কতল-বরাবর বাঁকাভাবে থাকে, তার-ই নাম কোনাস আর্টারিওসাস। নিলয় ও কোনাস আর্টারিওসাস যে ছিদ্রপথে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত, সেখানে তিনটি **অর্ধচন্দ্রাকার কপাটক** থাকে। একটি **অনুদৈর্ঘ্য সর্পিল কপাটক** কোনাস আর্টারিওসাসের গহ্বরকে অসম্পূর্ণভাবে তুভাগে ভাগ করে।

তিনটি মহাশিরা দিয়ে ফুস্‌ফুস ছাড়া দেহের অন্য সমস্ত অংশ থেকে রক্ত এসে সাইনাস ভেনোসাস পূর্ণ করলে, হৃৎপিণ্ডের এই প্রকোষ্ঠ সবচেয়ে আগে সঙ্কুচিত হয়। ফলে, রক্ত সাইনু-অরিক্যুলার ছিদ্রপথে

সাইনাস ভেনোসাস থেকে দক্ষিণ অলিন্দে প্রবেশ করে। এই সময়ের মধ্যে সাধারণ ফুস্‌ফুস-শিরার ছিদ্রের মধ্য দিয়ে ফুসফুস দুটি থেকে রক্ত এসে বাম অলিন্দে প্রবেশ করে। অলিন্দ দুটি রক্ত-পূর্ণ হলে, প্রায় একই সঙ্গে সঙ্কুচিত হয়। ফলে, রক্ত অলিন্দ দুটি থেকে অরিক্যুলো-ভেন্ট্রিক্যুলার ছিদ্রের মধ্য দিয়ে, নিলয়ে চলে আসে। এরপর নিলয়



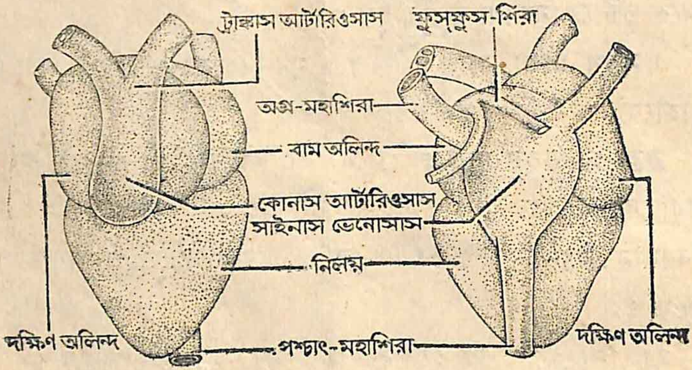

34 নং চিত্র— কুনো ব্যাঙের হৃৎপিণ্ডের দীর্ঘচ্ছেদ।

সঙ্কুচিত হয়। তখন রক্ত অর্ধচন্দ্রাকার কপাটক তিনটিকে ঠেলে কোনাস আর্টারিওসাসের মধ্যে প্রবেশ করে। তখন কোনাস আর্টারিওসাস সঙ্কুচিত হয়। এর ফলে, রক্ত কোনাস আর্টারিওসাস থেকে **ট্রাঙ্কাস আর্টারিওসাস** (Truncus arteriosus) নামের নলাকার অংশে প্রবেশ করে এবং সেখান থেকে ধমনী-তন্ত্রের (পরে দ্রষ্টব্য) মাধ্যমে, দেহের বিভিন্ন অংশে চলে যায়। হৃৎপিণ্ডের বিভিন্ন ছিদ্রপথে কপাটক থাকায়, রক্ত উল্টাপথে যেতে পারে না।

মানুষের হৃৎপিণ্ডে মোট চারটি প্রকোষ্ঠ থাকে— দুটি অলিন্দ এবং দুটি নিলয়।

**রক্তবাহ:** ধমনী, শিরা এবং রক্ত-জালক— কুনো ব্যাঙের দেহে এই তিন ধরনের রক্তবাহ দেখা যায়। যে রক্তবাহ হৃৎপিণ্ড অথবা হৃৎপিণ্ডের দিক থেকে অন্য কোনও অঙ্গে রক্ত বয়ে নিয়ে যায়, তার নাম **ধমনী**। ধমনীর মধ্য দিয়ে অক্সিজেন-যুক্ত উজ্জ্বল, লাল রঙের রক্ত

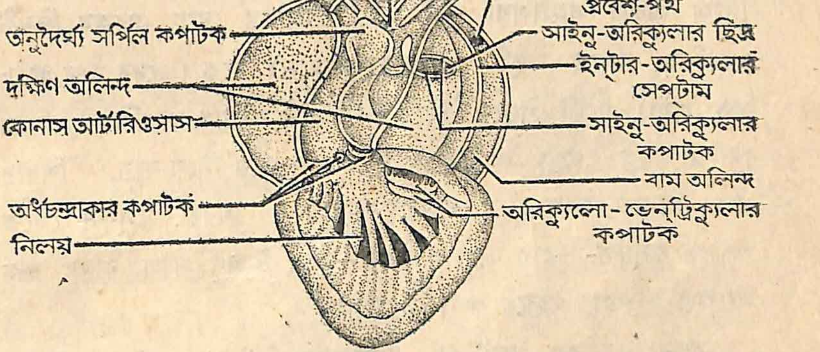
**কুল্যার কপাটক** নামের একজোড়া কপাটক থাকে। বাম অলিন্দের




33 নং চিত্র— কুনো ব্যাঙের হৃৎপিণ্ড : ক. অঙ্কদৃশ্য ; খ. পৃষ্ঠদৃশ্য।

প্রাকারেও একটি ছিদ্র থাকে। এই ছিদ্রপথে সাধারণ ফুস্‌ফুস-শিরা বাম অলিন্দের সঙ্গে যুক্ত। নিলয়ের সামনের অংশের অঙ্কভাগের ডান পাশ থেকে যে নলাকার প্রকোষ্ঠ উৎপন্ন হয় এবং অলিন্দ-দুটির অঙ্কতল-বরাবর বাঁকাভাবে থাকে, তার-ই নাম কোনাস আর্টারিওসাস। নিলয় ও কোনাস আর্টারিওসাস যে ছিদ্রপথে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত, সেখানে তিনটি **অর্ধচন্দ্রাকার কপাটক** থাকে। একটি **অনুদৈর্ঘ্য সর্পিল কপাটক** কোনাস আর্টারিওসাসের গহ্বরকে অসম্পূর্ণভাবে দুভাগে ভাগ করে।

তিনটি মহাশিরা দিয়ে ফুস্‌ফুস ছাড়া দেহের অন্য সমস্ত অংশ থেকে রক্ত এসে সাইনাস ভেনোসাস পূর্ণ করলে, হৃৎপিণ্ডের এই প্রকোষ্ঠ সবচেয়ে আগে সঙ্কুচিত হয়। ফলে, রক্ত সাইনু-অরিক্যুলার ছিদ্রপথে




34 নং চিত্র— কুনো ব্যাঙের হৃৎপিণ্ডের দীর্ঘচ্ছেদ।

সঙ্কুচিত হয়। তখন রক্ত অর্ধচন্দ্রাকার কপাটক তিনটিকে ঠেলে কোনাস আর্টারিওসাসের মধ্যে প্রবেশ করে। তখন কোনাস আর্টারিওসাস সঙ্কুচিত হয়। এর ফলে, রক্ত কোনাস আর্টারিওসাস থেকে **ট্রাঙ্কাস আর্টারিওসাস** (Truncus arteriosus) নামের নলাকার অংশে প্রবেশ করে এবং সেখান থেকে ধমনী-তন্ত্রের (পরে দ্রষ্টব্য) মাধ্যমে, দেহের বিভিন্ন অংশে চলে যায়। হৃৎপিণ্ডের বিভিন্ন ছিদ্রপথে কপাটক থাকায়, রক্ত উল্টাপথে যেতে পারে না।

মানুষের হৃৎপিণ্ডে মোট চারটি প্রকোষ্ঠ থাকে— দুটি অলিন্দ এবং দুটি নিলয়।

**রক্তবাহ :** ধমনী, শিরা এবং রক্ত-জালক— কুনো ব্যাঙের দেহে এই তিন ধরনের রক্তবাহ দেখা যায়। যে রক্তবাহ হৃৎপিণ্ড অথবা হৃৎপিণ্ডের দিক থেকে অন্য কোনও অঙ্গে রক্ত বয়ে নিয়ে যায়, তার নাম **ধমনী**। ধমনীর মধ্য দিয়ে অক্সিজেন-যুক্ত উজ্জ্বল, লাল রঙের রক্ত

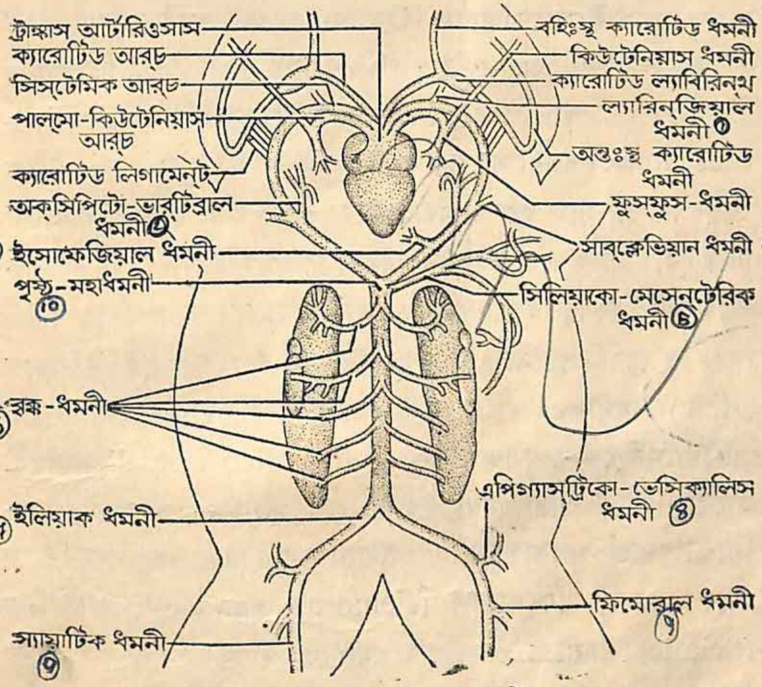
প্রবাহিত হয়। অবশ্য, ফুস্‌ফুস-ধমনী অর্থাৎ ফুস্‌ফুসে রক্ত-সরবরাহ-কারী ধমনী অক্সিজেন-বিহীন রক্ত বহন করে। মোটা ধমনীকে **মহাধমনী** এবং শাখা-ধমনীকে **ধমনিকা** বলে। ধমনিকা বারবার সরু শাখায় বিভক্ত হয়ে, অসংখ্য সূক্ষ্ম রক্তবাহ সৃষ্টি করে। এদের নাম **রক্ত-জালক**। রক্ত-জালকগুলি আবার মিলিত হয়ে, আর এক ধরনের সরু রক্তবাহ সৃষ্টি করে। এদের নাম **উপশিরা**। কয়েকটি উপশিরা মিলে একটি **শিরা** সৃষ্টি হয়। তেমনিভাবে, অনেকগুলি শিরা মিলে একটি **মহাশিরা** সৃষ্টি হয়। ব্যাঙের দেহে এরকম তিনটি মহাশিরা আছে— দুটি হৃৎপিণ্ডের সামনের দিকে (এদের নাম **অগ্র-মহাশিরা**), একটি পিছনের দিকে (এর নাম **পশ্চাৎ-মহাশিরা**)। শিরা বিভিন্ন অঙ্গ থেকে হৃৎপিণ্ডের দিকে রক্ত বয়ে নিয়ে যায়। শিরার রক্ত কাল্‌চে লাল এবং অক্সিজেন-বিহীন। অবশ্য, ফুস্‌ফুস থেকে আগত ফুস্‌ফুস-শিরার মধ্যে অক্সিজেন-যুক্ত, উজ্জ্বল লাল রঙের রক্ত থাকে। শিরার গহ্বরে কপাটক থাকে।

কুনো ব্যাঙের ছোট-বড় ধমনীগুলি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে বিন্যস্ত থেকে একটি **ধমনী-তন্ত্র** গঠন করে। তেমনিভাবে, ছোট-বড় শিরা-গুলিও **শিরা-তন্ত্র** গঠন করে। নিচে কুনো ব্যাঙের ধমনী-তন্ত্র ও শিরা-তন্ত্র সংক্ষেপে আলোচনা করা হল।

**ধমনী-তন্ত্র** : আগে বর্ণিত ট্রাঙ্কাস আর্টারিওসাস-ই ব্যাঙের সমস্ত ধমনীর মূল উৎস। ট্রাঙ্কাস আর্টারিওসাস দুভাগে ভাগ হয়ে দুটি **আর্টারিয়াল ট্রাঙ্ক্** (Arterial trunks) গঠন করে। এক-একটি আর্টারিয়াল ট্রাঙ্ক্ আবার তিনটি করে **অ্যায়োর্‌টিক আর্‌চ** (Aortic arches)-এ ভাগ হয়। যেমন— (1) সামনের দিকে **ক্যারোটিড আর্‌চ** (Carotid arches), মাঝখানে (2) **সিস্‌টেমিক আর্‌চ** (Systemic arches) এবং (3) পিছনদিকে **পাল্‌মো-কিউটেনিয়াস আর্‌চ** (Pulmo-cutaneous arches)।

প্রতি পাশের ক্যারোটিড আর্‌চ সামনের দিকে যাওয়ার পথে দেহের পরিধির দিকে বেঁকে গিয়ে **বহিঃস্থ ক্যারোটিড ধমনী** এবং

**অন্তঃস্থ ক্যারোটিড ধমনী**—এই দুটি শাখায় বিভক্ত হয়। প্রথম ধমনী মুখ-বিবরের তলদেশ, জিহ্বা ও মস্তকের পরিধি-অঞ্চলে রক্ত সরবরাহ করে। অন্তঃস্থ ক্যারোটিড ধমনীর উৎপত্তি-স্থলে একটি ফোলা অঞ্চল থাকে। এর নাম **ক্যারোটিড ল্যাবিরিন্থ** (Carotid labyrinth)। এই ধমনী আবার **ক্যারোটিড লিগামেন্ট** (Carotid ligaments) নামের কয়েকটি সুতার মতো অংশ দিয়ে সিস্টেমিক আর্চের সঙ্গে আটকে থাকে। মস্তিষ্কে রক্ত সরবরাহ করা এই ধমনীর কাজ।




35 নং চিত্র— কুনো ব্যাঙের ধমনী-তন্ত্র।

প্রতি পাশের সিস্টেমিক আর্চ প্রথমে দেহের পরিধির দিকে চলে যায়, কিন্তু পরে আবার অন্ননালীর পাশ দিয়ে বেঁকে, অন্ননালীর পৃষ্ঠ-দেশে চলে যায় এবং সেখানে অন্য পাশের সিস্টেমিক আর্চের সঙ্গে মিলিত হয়ে **পৃষ্ঠ-মহাধমনী** নামের মোটা ধমনী সৃষ্টি করে। প্রতিটি সিস্টেমিক আর্চ থেকে সবচেয়ে প্রথমে **ল্যারিন্জিয়াল**(Laryngeal)

**ধমনী** নামের ছোট ধমনী উৎপন্ন হয়ে ল্যারিঙ্গো-ট্রাকিয়াল প্রকোষ্ঠে রক্ত সরবরাহ করে। সিস্টেমিক আর্চ পিঠের দিকে যাওয়ার পথে, ভিতরের দিক থেকে একটি ধমনী সৃষ্টি করে। এর নাম **অক্সিপিটো-ভার্টিব্রাল** (Occipito-vertebral) **ধমনী**। এর কাজ মুখ-বিবর, মস্তকের পিছনের অংশ, মেরুদণ্ড ও সুষুম্নাকাণ্ডে রক্ত সরবরাহ করা। অক্সিপিটো-ভার্টিব্রাল ধমনীর উৎপত্তি-স্থলের বাইরের দিকের কাছ থেকে **সাবক্লেভিয়ান** (Subclavian) **ধমনী** নামের ধমনী উৎপন্ন হয়ে, অগ্রপদে রক্ত সরবরাহ করে। কেবলমাত্র বাঁদিকের সিস্টেমিক আর্চ থেকে **ইসোফেজিয়াল** (Oesophageal) **ধমনী** নামের একটি ধমনী উৎপন্ন হয়ে, অন্ননালীতে রক্ত সরবরাহ করে। পৃষ্ঠ-মহাধমনীর উৎপত্তিস্থলের কাছ থেকে **সিলিয়াকো-মেসেন্টেরিক** (Coelico-mesenteric) **ধমনী** নামের একটি মোটা ধমনী উৎপন্ন হয়ে, পৌষ্টিক তন্ত্রের বিভিন্ন অঙ্গে রক্ত সরবরাহ করে। বৃক্ক দুটির মাঝামাঝি অঞ্চল দিয়ে যাওয়ার পথে, পৃষ্ঠ মহাধমনী থেকে চার পাঁচ জোড়া সরু **বৃক্ক ধমনী** উৎপন্ন হয়ে, বৃক্ক ও জনন অঙ্গে রক্ত সরবরাহ করে। দেহ গহ্বরের পিছনের প্রান্তে পৌঁছে, পৃষ্ঠ মহাধমনী দুটি **ইলিয়াক** (Iliac) **ধমনী**-তে ভাগ হয়। প্রতিটি ইলিয়াক ধমনী থেকে **এপিগ্যাস্ট্রিকো-ভেসিক্যালিস** (Epigastrico vesicalis) **ধমনী** নামের একটি সূক্ষ্ম ধমনী উৎপন্ন হয়ে, মূত্রাশয় এবং অঙ্কীয় দেহ-প্রাকারে রক্ত সরবরাহ করে। ইলিয়াক ধমনী এর পর পশ্চাৎ-পদে প্রবেশ করে, **ফিমোরাল** (Femoral) **ধমনী** এবং **স্যায়াটিক** (Sciatic) **ধমনী** নামের দুটি ধমনীতে বিভক্ত হয়ে, পশ্চাৎ-পদের বিভিন্ন অংশে রক্ত সরবরাহ করে।

প্রতি পাশের পাল্‌মো-কিউটেনিয়াস আর্চের প্রধান অংশ প্রথমে বাইরের দিকে এবং পরে পিছনের দিকে বেঁকে গিয়ে ফুস্‌ফুসে প্রবেশ করে। এই ধমনীর নাম **ফুস্‌ফুস ধমনী**। এই ধমনী ফুস্‌ফুসে রক্ত সরবরাহ করে।

ফুস্‌ফুসে প্রবেশ করার আগে, এই আর্চ থেকে একটি সূক্ষ্ম ধমনী

উৎপন্ন হয়ে, চর্মে রক্ত সরবরাহ করে। এই ধমনীর নাম **কিউটেনিয়াস** (Cutaneous) **ধমনী**।

**শিরা-তন্ত্র :** ব্যাঙের শিরা-তন্ত্রের শিরাগুলিকে মোটামুটি তিন দলে ভাগ করা যায়— (ক) ফুস্‌ফুস-শিরা, (খ) সিস্‌টেমিক (Systemic) শিরা, এবং (গ) পোর্টাল (Portal) শিরা।

দুটি ফুস্‌ফুস থেকে দুটি **ফুস্‌ফুস শিরা** অক্সিজেন-যুক্ত রক্ত সংগ্রহ করে, হৃৎপিণ্ডের দিকে অগ্রসর হয়। শেষে বাম অলিন্দের পৃষ্ঠদেশে এরা পরস্পর মিলিত হয়ে, একটি **সাধারণ ফুস্‌ফুস-শিরা** সৃষ্টি করে। এই শিরাটি একটি ছিদ্রের সাহায্যে বাম অলিন্দের গহ্বরে মুক্ত হয়।

যে শিরা কোনও অঙ্গের রক্ত-জালক থেকে উৎপন্ন হয়ে হৃৎপিণ্ডের দিকে যাওয়ার পথে দ্বিতীয় কোনও অঙ্গের মধ্যে রক্ত-জালকে বিভক্ত হয় না, তাকে **সিস্‌টেমিক শিরা** বলে। সমস্ত সিস্‌টেমিক শিরা সাইনাস ভেনোসাসের তিনটি কোণের সঙ্গে যুক্ত তিনটি **মহাশিরা-র** সঙ্গে এসে মিলিত হয়। সামনের দিকের মহাশিরা দুটিকে **অগ্র-মহাশিরা** এবং পিছনের দিকের মহাশিরাটিকে **পশ্চাৎ-মহাশিরা** বলে।

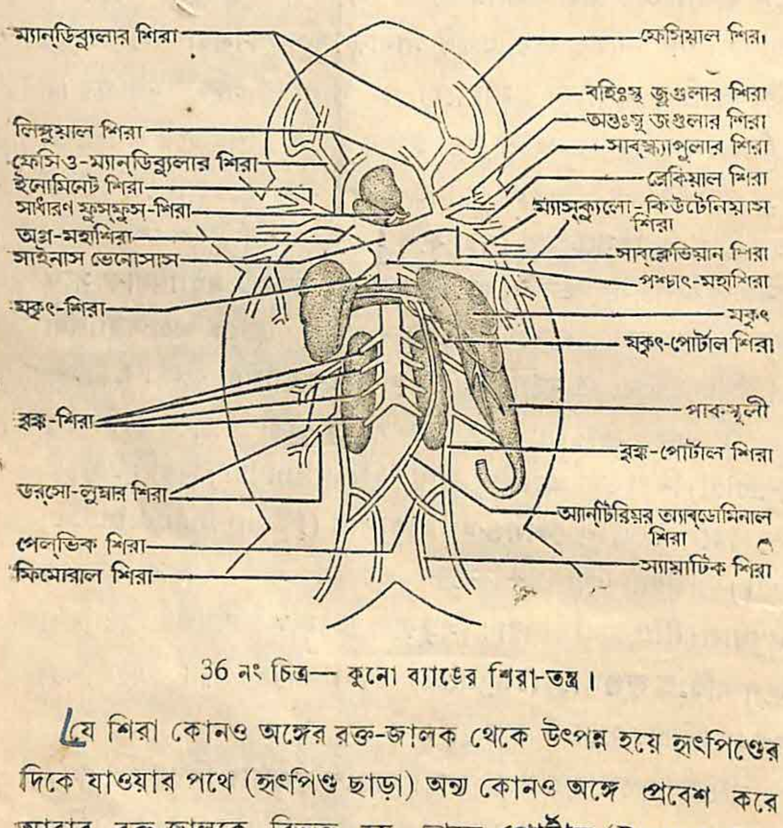
তুণ্ড এবং চোয়াল থেকে রক্ত সংগ্রহ করে যথাক্রমে **ফেসিয়াল** (Facial) **শিরা** এবং **ম্যাণ্ডিব্যুলার** (Mandibular) **শিরা**। এই দুটি শিরা মিলে তৈরী হয় **ফেসিও-ম্যাণ্ডিব্যুলার** (Facio-mandibular) **শিরা**। জিহ্বা এবং মুখ-বিবরের তলদেশ থেকে রক্ত সংগ্রহ করে **লিঙ্গুয়াল** (Lingual) **শিরা**। লিঙ্গুয়াল ও ফেসিও-ম্যাণ্ডিব্যুলার শিরা মিলে **বহিঃস্থ জুগুলার (Jugular) শিরা** গঠিত হয়। এই শিরা অগ্র-মহাশিরার সঙ্গে মিলিত হয়।

মস্তিষ্ক থেকে রক্ত-সংগ্রহকারী **অন্তঃস্থ জুগুলার শিরা** এবং কাঁধ-অঞ্চল থেকে রক্ত-সংগ্রহকারী **সাব্‌স্ক্যাপুলার** (Subscapular) **শিরা** মিলে তৈরী হয় **ইনোমিনেট (Innominate) শিরা**। এই শিরাও অগ্র-মহাশিরায় মিলিত হয়।

পেশী ও চর্ম থেকে রক্ত সংগ্রহকারী **মাস্‌ক্যুলো-কিউটেনিয়াস** (Musculo cutaneous) **শিরা** এবং অগ্রপদ থেকে রক্ত-সংগ্রহ-

কারী **ব্রেকিয়াল** (Brachial) **শিরা** মিলে **সাবক্লেভিয়ান** (Subclavian) **শিরা** তৈরী হয়। এই শিরা অগ্র-মহাশিরার পিছনের প্রান্তের সঙ্গে মিলিত হয়।

বৃক্ক দুটি থেকে রক্ত-সংগ্রহকারী চারজোড়া **বৃক্ক-শিরা** এবং যকৃতের দুটি প্রধান খণ্ড থেকে উৎপন্ন একজোড়া **যকৃৎ-শিরা** এসে পশ্চাৎ-মহাশিরার সঙ্গে মিলিত হয়।




36 নং চিত্র— কুনো ব্যাঙের শিরা-তন্ত্র।

যে শিরা কোনও অঙ্গের রক্ত-জালক থেকে উৎপন্ন হয়ে হৃৎপিণ্ডের দিকে যাওয়ার পথে (হৃৎপিণ্ড ছাড়া) অন্য কোনও অঙ্গে প্রবেশ করে আবার রক্ত-জালকে বিভক্ত হয়, তাকে **পোর্টাল** (Portal) **শিরা** বলে। ব্যাঙের পোর্টাল শিরাগুলি দুটি **পোর্টাল-তন্ত্র** গঠন করে।

**ফিমোরাল** (Femoral) **শিরা** এবং **স্যায়াটিক** (Sciatic) **শিরা** নামের দুটি শিরা যথাক্রমে উরুর সামনের ও পিছনের দিক থেকে রক্ত সংগ্রহ করে দেহ-গহ্বরের মধ্যে প্রবেশ করার পর, একসঙ্গে মিলে

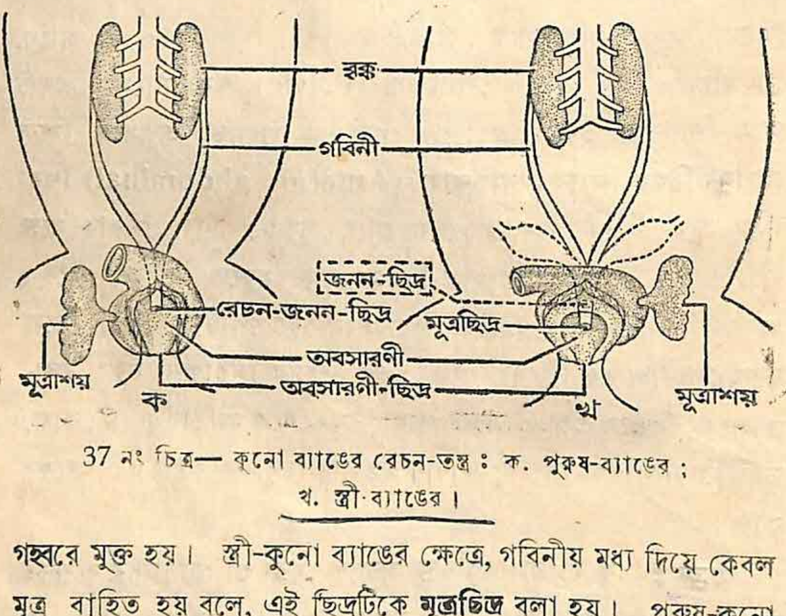
একটি করে **বৃক্ক-পোর্টাল শিরা** সৃষ্টি করে। এই শিরা বৃক্কের বাইরের প্রান্ত দিয়ে বৃক্কে প্রবেশ করে। পৃষ্ঠ-দেহ প্রাকার থেকে উৎপন্ন দু-তিনটি **ডর্সো-লুম্বার** (Dorso-lumber) **শিরা** বৃক্ক-পোর্টাল শিরার সঙ্গে মিলিত হয়। বৃক্ক-পোর্টাল শিরা এবং ডর্সো-লুম্বার শিরাগুলি মিলে কুনো ব্যাঙের **বৃক্ক-পোর্টাল তন্ত্র** গঠিত হয়। এই তন্ত্রের শিরাগুলি বৃক্কে রক্ত-জালকে বিভক্ত হয়। এই রক্ত-জালকের সাহায্যে বৃক্ক দ্বারা রক্ত থেকে রেচন-পদার্থ দূরীভূত হয়।

পাকস্থলী, অন্ত্র, অগ্ন্যাশয়, প্লীহা ইত্যাদি থেকে রক্ত-সংগ্রহকারী কয়েকটি শিরা মিলে **যকৃৎ-পোর্টাল শিরা** গঠন করে। আবার ফিমোরাল শিরার সঙ্গে স্যায়াটিক শিরা মিলিত হওয়ার আগে, ফিমোরাল শিরা থেকে **পেল্ভিক** (Pelvic) **শিরা** নামের একটি শাখা-শিরা বের হয়। দুপাশের পেল্ভিক শিরা দুটি একসঙ্গে মিলে **অ্যান্টিরিয়র অ্যাব্ডোমিনাল** (Anterior abdominal) **শিরা** গঠন করে। এই শিরা যকৃতের কাছে যকৃৎ-পোর্টাল শিরার সঙ্গে মিলিত হয় এবং পরে শাখায় বিভক্ত হয়ে যকৃতে প্রবেশ করে। অ্যান্টিরিয়র অ্যাব্ডোমিনাল শিরা এবং যকৃৎ-পোর্টাল শিরা মিলে **যকৃৎ পোর্টাল-তন্ত্র** তৈরী হয়। এই তন্ত্রের শিরাগুলি যকৃৎ রক্ত-জালকে বিভক্ত হয়। যকৃৎ দ্বারা রক্ত থেকে অতিরিক্ত গ্লুকোজ, দুর্গন্ধযুক্ত নানারকম পদার্থ, জীবাণু ইত্যাদি বিদূরিত করা এই তন্ত্রের কাজ।

**রক্ত :** কুনো ব্যাঙের রক্ত অন্যান্য মেরুদণ্ডী প্রাণীদের রক্তেরই মতো। তৃতীয় পরিচ্ছেদে রক্ত সম্বন্ধে যে বিবরণ দেওয়া হয়েছে, তা ব্যাঙের রক্তের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। তবে, ব্যাঙের লোহিত রক্তকণিকা দ্বি- উত্তল, উপবৃত্তাকার, 0·0223 মিলিমিটার লম্বা এবং 0·016 মিলিমিটার চওড়া। এই রক্তকণিকায় ডিম্বাকার নিউক্লিয়াস থাকে। এক ঘন-মিলিমিটার কোলা ব্যাঙের রক্তে তিন থেকে চার লক্ষ লোহিত রক্তকণিকা এবং সাড়ে পাঁচ হাজার থেকে সাত হাজার শ্বেত রক্তকণিকা থাকে।

**রেচন তন্ত্র ঃ** একজোড়া বৃক্ক কুনো ব্যাঙের রেচন-তন্ত্রের প্রধান অঙ্গ। উদর-অঞ্চলে, মেরুদণ্ডের দুপাশে, বৃক্ক দুটি পৃষ্ঠ-প্রাকারের সঙ্গে যুক্ত থাকে। এরা চ্যাপ্টা, লম্বাটে, উপবৃত্তাকার এবং লাল্‌চে বাদামী রঙের। বৃক্কের পরিধিতে কয়েকটি খাঁজ থাকে। এদের বাইরের দিক অল্প উত্তল, ভিতরের দিক সোজা। বৃক্কে মূত্র তৈরী হয়।

বৃক্ক দুটির বাইরের প্রান্ত থেকে একটি করে ঈষদচ্ছ, সাদাটে নালী বের হয়। এদের নাম **গবিনী**। এরা দেহের মধ্যরেখার দুপাশ দিয়ে পিছনদিকে যাওয়ার সময়, অল্প মোটা হয়ে দেহ-গহ্বরের শেষের দিকে পৌঁছে, পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হয়। এই মিলিত নালীটি অবসারণীর




37 নং চিত্র— কুনো ব্যাঙের রেচন-তন্ত্র ঃ ক. পুরুষ-ব্যাঙের ; খ. স্ত্রী-ব্যাঙের।

গহ্বরে মুক্ত হয়। স্ত্রী-কুনো ব্যাঙের ক্ষেত্রে, গবিনীর মধ্য দিয়ে কেবল মূত্র বাহিত হয় বলে, এই ছিদ্রটিকে **মূত্রছিদ্র** বলা হয়। পুরুষ-কুনো ব্যাঙের গবিনীর মধ্য দিয়ে মূত্র এবং শুক্রাণু বাহিত হয়। সেইজন্য এদের গবিনী-ছিদ্রকে **রেচন-জনন-ছিদ্র** বলা যায়।

অবসারণীর অঙ্ক-প্রাকার থেকে পাত্‌লা প্রাকারের একটি ছোট থলি উৎপন্ন হয়। এটি অসম্পূর্ণভাবে দ্বিখণ্ডিত এবং মূত্রাশয় নামে পরিচিত। একটি ছিদ্রের সাহায্যে অবসারণীর গহ্বরের সঙ্গে মূত্রাশয়টি যুক্ত। সাময়িকভাবে মূত্র জমা করে রাখাই মূত্রাশয়ের কাজ।

মলাশয়ের পিছনদিকে **অবসারণী** নামের একটি ছোট প্রকোষ্ঠ থাকে। এখানে মলাশয়, মূত্রাশয়, (পুরুষ-কুনো ব্যাঙের ক্ষেত্রে) গবিনী অথবা (স্ত্রী-কুনো ব্যাঙের ক্ষেত্রে) ডিম্বনালী মুক্ত হয়। বাইরে যাওয়ার সময়, মূত্রকে অবসারণীর মধ্য দিয়ে যেতে হয়।

দেহকাণ্ডের শেষ-প্রান্তে অবস্থিত একটি ছিদ্রের সাহায্যে অবসারণী বাইরে মুক্ত হয়। এর নাম **অবসারণী-ছিদ্র**। এই ছিদ্রের মধ্য দিয়ে মল, মূত্র এবং শুক্রাণু অথবা ডিম্বাণু দেহের বাইরে যায়।

বৃক্কের সাহায্যে প্রধানতঃ নাইট্রোজেন-ঘটিত রেচন-পদার্থ বিদূরিত হয়। বৃক্ক ছাড়া, ব্যাঙের আরও কতকগুলি অঙ্গ, যেমন— ফুস্‌ফুস, চর্ম, যকৃৎ এবং বৃহদন্ত্র অন্যান্য রেচন-পদার্থ দূরীকরণে সাহায্য করে।

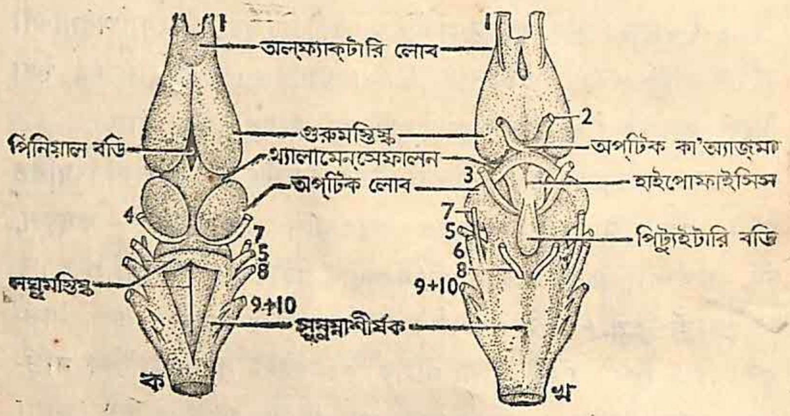
**নার্ভ-তন্ত্র ঃ** দেহের পৃষ্ঠ-মধ্যরেখা-বরাবর অবস্থিত এবং নার্ভ-কলা দিয়ে তৈরী একটি ফাঁপা নলের মতো গঠনই কুনো ব্যাঙের নার্ভ-তন্ত্রের প্রধান অংশ। নলের মতো এই অংশের সামনের দিক ফোলা এবং কয়েকটি ভাগে বিভক্ত। এর নাম **মস্তিষ্ক**। পিছনের বাকি অংশকে বলা হয় **সুষুম্নাকাণ্ড**। নিচে সংক্ষেপে কুনো ব্যাঙের মস্তিষ্ক ও সুষুম্নাকাণ্ডের বিবরণ দেওয়া হল।

**মস্তিষ্ক ঃ** মস্তিষ্ক করোটিকা (পরে দ্রষ্টব্য) অংশের মধ্যে থাকে। এর চারদিকে দুটি স্তর দিয়ে তৈরী একটি আবরণ থাকে। মস্তিষ্ক ফাঁপা বলে, এর ভিতরে কয়েকটি গহ্বর থাকে। এই গহ্বরগুলি **সেরিব্রো-স্পাইনাল** (Cerebro-spinal) **তরল** নামের তরল পদার্থ দিয়ে পূর্ণ থাকে।

কুনো ব্যাঙের মস্তিষ্কের তিনটি প্রাথমিক ভাগ— (ক) সামনের দিকে **পুরোমস্তিষ্ক** বা **প্রোসেন্‌সেফালন** (Procencephalon), (খ) মাঝখানে **মধ্যমস্তিষ্ক** বা **মেসেন্‌সেফালন** (Mesencephalon) এবং (গ) পিছনদিকে **পরাঙ্‌মস্তিষ্ক** বা **রম্বেন্‌সেফালন** (Rhombencephalon)।

পুরোমস্তিষ্কের আবার দুটি ভাগ। সামনের দিকের ভাগের নাম **টেলেন্‌সেফালন** (Telencephalon)। এর শীর্ষে দুটি ছোট ফোলা

অঞ্চল পাশাপাশি থাকে। এদের নাম **অল্ফ্যাক্টারি লোব** (Olfactory lobes)। এই লোব দুটি মস্তিষ্কের ঘ্রাণকেন্দ্র। অল্ফ্যাক্টারি লোব দুটির পিছনে দুটি লম্বাটে অর্ধগোলাকার অংশ পাশাপাশি থাকে। এদের নাম **সেরিব্রাল হেমিস্ফিয়ার** (Cerebral




38 নং চিত্র— কুনো ব্যাঙের মস্তিষ্ক : ক. পৃষ্ঠদৃশ্য ; খ. অঙ্কদৃশ্য।

hemisphere)। সেরিব্রাল হেমিস্ফিয়ার দুটিকে একসঙ্গে **গুরুমস্তিষ্ক** বলা হয়। বোধশক্তি, চেতনা-বোধ, স্মরণ-শক্তি ইত্যাদি এবং ঐচ্ছিক চলন গুরুমস্তিষ্কের উপর নির্ভরশীল। অবশ্য, কুনো ব্যাঙের স্মরণ-শক্তি ইত্যাদি খুবই অল্প।

পুরোমস্তিষ্কের পিছনদিকের ভাগের নাম **ডা'য়েনসেফালন** (Diencephalon) বা **থ্যালামেন্সেফালন** (Thalamencephalon)। মস্তিষ্কের এই অংশ গুরুমস্তিষ্কের পিছনে অবস্থিত। এর পৃষ্ঠভাগ নিচু। এখানে একটি ছোট উঁচু অংশ দেখা যায়। এটির নাম **এপিফাইসিস** (Epiphysis)। এপিফাইসিসের মুক্ত প্রান্তের সঙ্গে **পিনিয়াল বডি** (Pineal body) নামের একটি সূক্ষ্ম বস্তু যুক্ত থাকে। থ্যালামেন্সেফালনের অঙ্কদেশে অপ্‌টিক নার্ভ (Optic nerves) দুটি (পরে দ্রষ্টব্য) পরস্পরকে ছেদ করায়, X-আকৃতির যে অংশ তৈরী হয়, তাকে বলে **অপ্‌টিক কা'অ্যাজ্‌মা** (Optic chiasma)। অপ্‌টিক কা'য়্যাজ্‌মার পিছনদিকে একটি চার-কোনা লম্বাটে অংশ দেখা যায়।

এর নাম **ইনফাণ্ডিবুলাম** (Infundibulum) বা **হাইপোফাইসিস-** (Hypophysis)। হাইপোফাইসিসের সঙ্গে **পিটুইটারি বডি** (Pituitary body) নামের একটি গোলাকার অনাল গ্রন্থি যুক্ত থাকে।

থ্যালামেন্‌সেফালনের পিছনে মধ্যমস্তিষ্কের অবস্থান। এই অঞ্চলের পৃষ্ঠদেশে তুটি গোলাকার ফাঁপা অংশ থাকে। এদের নাম **অপ্‌টিক লোব** (Optic lobes), মানুষের চারটি অপ্‌টিক লোব থাকে। মধ্য-মস্তিষ্ক ব্যাঙের দৃষ্টিকেন্দ্র। দৃষ্টি-শক্তি নিয়ন্ত্রণ করা এর প্রধান কাজ।

পরাঙ্‌মস্তিষ্কেরও আবার তুটি ভাগ **মেটেন্‌সেফালন** (Metencephalon) এবং **মাইলেন্‌সেফালন** (Myelencephalon)। অপ্‌টিক লোব তুটির পিছনে একটি সরু অনুপ্রস্থ অংশই মেটেন্‌সেফালন। একে **লঘুমস্তিষ্ক** বলা হয়। গমন ও ভারসাম্য-রক্ষাজনিত ঐচ্ছিক চলনের মধ্যে সমন্বয়-সাধন করা লঘুমস্তিষ্কের কাজ। এছাড়া, লঘুমস্তিষ্ক স্বতঃক্রিয় চলনের কৌশল নিয়ন্ত্রণ করে।

মাইলেন্‌সেফালনের লঘুমস্তিষ্কের পিছনদিক থেকে ক্রমে সরু হয়ে, করোটির মহাবিবরের মধ্য দিয়ে পিছনদিকে অবস্থিত সুষুম্নাকাণ্ডের সঙ্গে মিলিত হয়। মাইলেন্‌সেফালনের অঙ্কদেশ এবং তুপাশ খুব পুরু। এইগুলিকে একসঙ্গে **সুষুম্নাশীর্ষক** বলে। শিকার ধরা, স্বর সৃষ্টি করা, জিহ্বার চলন, খাদ্য গেলা, শ্বসন, হৃৎ-ঘাত, গমন ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ করা সুষুম্নাশীর্ষকের কাজ।

নিচে ব্যাঙের মস্তিষ্কের পাঁচটি অংশকে ছকের আকারে দেওয়া হল ঃ

**মস্তিষ্ক**

- পুরোমস্তিষ্ক বা প্রোসেনসেফালন
  - টেলেন্‌সেফালন
  - ডা'য়েন্‌সেফালন বা থ্যালামেন্‌সেফালন
- মধ্যমস্তিষ্ক
- পরাঙ্‌মস্তিষ্ক বা রম্বেন্‌সেফালন
  - মেটেন্‌সেফালন
  - মাইলেন্‌সেফালন

সুষুম্নাকাণ্ড: সুষুম্নাকাণ্ড সুষুম্নাশীর্ষকের পিছনের দিকে থেকে উৎপন্ন হয়ে, মেরুদণ্ডের কশেরুকাগুলির নিউরাল ক্যান্যাল (Neural canal)-এর মধ্য দিয়ে পিছন দিকে যায় এবং শেষে মেরুদণ্ডের ইউরোস্টাইল (Urostyle)-এর মধ্যে প্রবেশ করার পর, ক্রমে সরু হয়ে শেষ হয়। সুষুম্নাকাণ্ডের এই সরু শেষভাগের নাম **ফাইলাম টারমিনেল** (Filum terminale)। সুষুম্নাকাণ্ডের পৃষ্ঠ-মধ্যরেখা বরাবর এবং অঙ্ক-মধ্যরেখা বরাবর একটি করে খাঁজ থাকে। ফাঁপা বলে, সুষুম্নাকাণ্ডের কেন্দ্রে একটি গহ্বর থাকে। এর নাম **নিউরোসিল** (Neurocoel)।

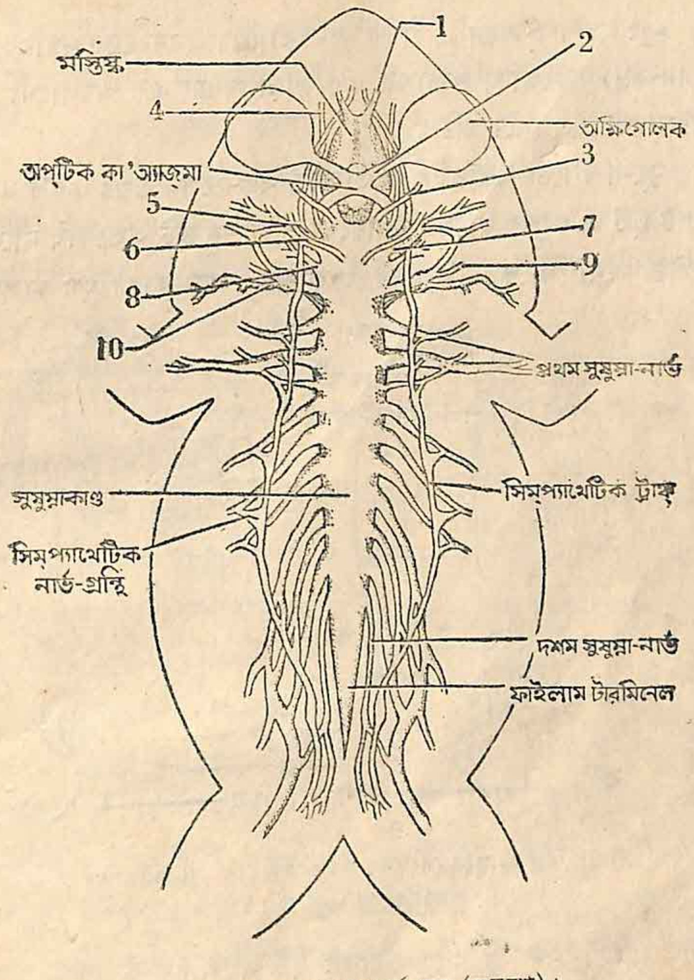
সুষুম্না-নার্ভ (পরে দ্রষ্টব্য) এবং মস্তিষ্কের মধ্যে তথ্য ও নির্দেশ আদান-প্রদান করা সুষুম্নাকাণ্ডের প্রধান কাজ। এছাড়া, সুষুম্নাকাণ্ড স্থানীয় প্রতিবর্ত ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে।

মস্তিষ্ক এবং সুষুম্নাকাণ্ড নিয়ে নার্ভ-তন্ত্রের যে প্রধান অংশ তৈরী হয় তাকে বলে **কেন্দ্রীয় নার্ভ-তন্ত্র**। কুনো ব্যাঙের মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশ থেকে মোট দশ জোড়া নার্ভ বের হয়। এদের নাম **করোটিক নার্ভ**। সুষুম্নাকাণ্ডের দুপাশ থেকেও দশ জোড়া নার্ভ উৎপন্ন হয়। এদের বলা হয় সুষুম্না-নার্ভ। করোটিক নার্ভ ও সুষুম্না-নার্ভগুলি মিলে **প্রান্তঃস্থ নার্ভ-তন্ত্র** তৈরী হয়। মানুষের করোটিক নার্ভের সংখ্যা বারো জোড়া।

কাজের দিক দিয়ে, প্রান্তঃস্থ নার্ভ-তন্ত্রের নার্ভগুলি তিন ধরনের। কতকগুলি নার্ভ চক্ষু, কর্ণ ইত্যাদি জ্ঞানেন্দ্রিয় থেকে অনুভূতি বয়ে নিয়ে কেন্দ্রীয় নার্ভ-তন্ত্রে পৌঁছে দেয়। এদের বলা হয় **অন্তর্বাহী নার্ভ** বা **সংবেদ-নার্ভ**। অন্য এক ধরনের নার্ভ কেন্দ্রীয় নার্ভ-তন্ত্রের নির্দেশ বিভিন্ন অঙ্গে বহন করে নিয়ে যায়। এদের নাম **বহির্বাহী নার্ভ** বা **চেষ্টীয় নার্ভ**। তৃতীয় ধরনের নার্ভ এই দুরকম কাজই করতে পারে। এদের **মিশ্র-নার্ভ** বলা হয়। করোটিক নার্ভ সংবেদ-, চেষ্টীয় অথবা মিশ্র হতে পারে। কিন্তু সমস্ত সুষুম্না-নার্ভ মিশ্র-নার্ভ।

কুনো ব্যাঙের পৃষ্ঠ-মহাধমনীর দুপাশ-বরাবর **সিমপ্যাথেটিক**

ট্রাঙ্ক্ (Sympathetic trunks) বা **সিম্প্যাথেটিক নার্ভ-সূত্র** নামের নার্ভ-গ্রন্থিযুক্ত ছুটি নার্ভ-সূত্র থাকে। এদের সঙ্গে সুষুম্না-




39 নং চিত্র— কুনো ব্যাঙের নার্ভ-তন্ত্র (অঙ্কদৃশ্য)।

নার্ভগুলির যোগাযোগ আছে। এই নার্ভ-সূত্র ছুটি কুনো ব্যাঙের **স্বতঃক্রিয় নার্ভ-তন্ত্র** গঠন করে।*

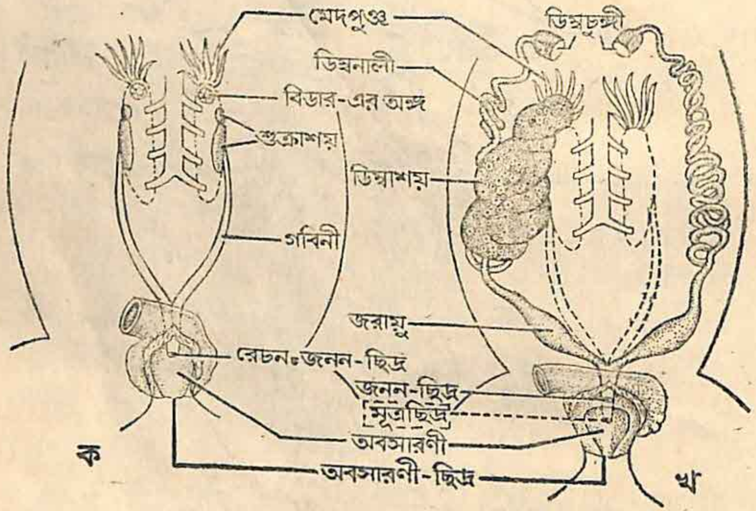
---

*নার্ভ-তন্ত্রের আরও বিবরণ এবং বিস্তারিত কার্যকারিতা দশম শ্রেণীর আলোচ্য বিষয়।

**জনন-তন্ত্র :** কুনো-ব্যাঙ **একলিঙ্গ** প্রাণী, অর্থাৎ এদের স্ত্রী-পুরুষ-ভেদ আছে। নিচে পুরুষ এবং স্ত্রী-কুনো-ব্যাঙের জনন-তন্ত্র আলাদা ভাবে বর্ণনা করা হল।

**পুং-জনন-তন্ত্র :** পুরুষ কুনো-ব্যাঙের জনন-তন্ত্র (অর্থাৎ পুং-জনন-তন্ত্র) একজোড়া শুক্রাশয়, একজোড়া গবিনী এবং অবসারণী ও অবসারণী-ছিদ্র নিয়ে গঠিত।

কুনো-ব্যাঙের বৃক্ক দুটির প্রত্যেকটির অঙ্ক-তলের উপর একটি করে মোট দুটি **শুক্রাশয়** থাকে। মানুষের শুক্রাশয় দুটি অণ্ডকোষ নামের থলির মধ্যে থাকে। ব্যাঙের শুক্রাশয় বেলনাকার এবং হাল্কা




40 নং চিত্র— কুনো-ব্যাঙের জনন-তন্ত্র : ক পুং-জনন-তন্ত্র ; খ. স্ত্রী-জনন-তন্ত্র।

হলুদ রঙের। অনেক সময় শুক্রাশয় দুটি অথবা তিনটি ছোট ছোট খণ্ডে বিভক্ত থাকে। শুক্রাণু উৎপাদন করা শুক্রাশয়ের কাজ।

প্রতিটি বৃক্কের বাইরের প্রান্ত থেকে একটি করে ঈষদচ্ছ সাদাটে **গবিনী** নামের যে নালী বের হয়, তাদেরই-ই মধ্য দিয়ে শুক্রাণু বাহিত হয়। অতএব, পুরুষ কুনো-ব্যাঙের গবিনী **শুক্রনালী**-র কাজ করে। সেইজন্য, এদের **রেচন-জনন নালী** বলা যায়। এরা **রেচন-জনন-ছিদ্র**

নামের একটি ছিদ্র দিয়ে **অবসারণী**-র গহ্বরে মুক্ত হয়। শুক্রাণু শুক্রাশয় থেকে গবিনী, গবিনী থেকে অবসারণী এবং সেখান থেকে **অবসারণী-ছিদ্র** নামের ছিদ্রের মধ্য দিয়ে দেহের বাইরে যায়।

বৃক্কের সামনের দিকের অঙ্ক-তলে, শুক্রাশয়ের কাছে একটি করে ছোট গোলাকার অঙ্গ দেখা যায়। এর নাম **বিডার-এর** (Bidder's) **অঙ্গ**। এরা ক্ষয়প্রাপ্ত ডিম্বাশয়। এদের কোন কাজ নেই। বৃক্কের সামনের প্রান্তের সঙ্গে যুক্ত কতকগুলি সূক্ষ্ম আঙুলের মতো হলুদ রঙের বস্তু দেখা যায়। এদের **মেদপুঞ্জ** বলা হয়। মেদপুঞ্জে প্রচুর পরিমাণে স্নেহদ্রব্য সঞ্চিত থাকে। শুক্র উৎপাদনের সময় প্রয়োজনীয় শক্তি সরবরাহ করা এদের কাজ।

**স্ত্রী-জনন-তন্ত্র :** স্ত্রী-কুনো ব্যাঙের জনন-তন্ত্র (অর্থাৎ, স্ত্রী-জনন-তন্ত্র) একজোড়া ডিম্বাশয়, একজোড়া ডিম্বনালী এবং অবসারণী ও অবসারণী-ছিদ্র নিয়ে গঠিত।

বৃক্ক দুটির অঙ্ক-তলের সঙ্গে ডিম্বাশয় দুটি আটকানো থাকে। পরিণত ডিম্বাশয় কালো রঙের, অনিয়মিত পরিধি-যুক্ত থলির মতো এবং অসম্পূর্ণভাবে কয়েকটি খণ্ডে বিভক্ত। এরা দেহ-গহ্বরকে প্রায় পূর্ণ করে ফেলে। ডিম্বাণু উৎপাদন করা ডিম্বাশয়ের কাজ। ডিম্বাণু পরিণত হলে ডিম্বাশয়ের আবরণ ফেটে ডিম্বাণু দেহ-গহ্বরে চলে আসে।

বৃক্ক দুটির বাইরের দিকে, দেহ-গহ্বরের দুপাশ-বরাবর দুটি **ডিম্বনালী** থাকে। এদের সঙ্গে ডিম্বাশয়ের সরাসরি কোন যোগ নেই। ডিম্বনালীর প্রথম অংশ ছোট ফুঁদেলের মতো। এর নাম **ডিম্বচুঙ্গী**। ডিম্বচুঙ্গী ফুস্ফুসের কাছে থাকে। ডিম্বাণু দেহ-গহ্বর থেকে ডিম্বচুঙ্গীতে প্রবেশ করে। ডিম্বনালীর পরের অংশ সরু, পুরু, প্রাকার-যুক্ত এবং প্যাঁচানো। ডিম্বনালীর শেষ অংশ ফোলা এবং পাত্‌লা প্রাকার-যুক্ত। এর নাম **জরায়ু** বা **ডিম্বথলি**। এখানে ডিম্বাণুগুলি সাময়িকভাবে সঞ্চিত থাকে। জরায়ু দুটি পিছনদিকে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে একটি সাধারণ নালী গঠন করে। এই সাধারণ নালীটি অবসারণীর পৃষ্ঠদেশে মূত্রছিদ্রের কাছে অবস্থিত জনন-ছিদ্র নামের ছিদ্র-পথে **অবসারণী**-তে

মুক্ত হয়। ডিম্বাণু অবশেষে **অবসারণী-ছিদ্র** দিয়ে দেহের বাইরে আসে। স্ত্রী-কুনো-ব্যাঙের বৃক্কের সঙ্গেও **মেদপুঞ্জ** আটকানো থাকে। ডিম্বাণু উৎপাদনের সময় প্রয়োজনীয় শক্তি সরবরাহ করা মেদপুঞ্জের কাজ।

**কঙ্কাল-তন্ত্র ঃ** দেহের নির্দিষ্ট আকার বজায় রাখার জন্য এবং স্বচ্ছন্দে চলাফেরা করার জন্য প্রাণীদের দেহে একটি শক্ত কাঠামো থাকে। এর নাম **কঙ্কাল**। কুনো-ব্যাঙের কঙ্কাল দেহের ভিতরে থাকে এবং প্রধানতঃ **অস্থি** দিয়ে তৈরী। অনেকগুলি ছোট-বড় অস্থি নিয়ে ব্যাঙের কঙ্কাল তৈরী হয়। এই অস্থিগুলি একসঙ্গে ব্যাঙের **কঙ্কাল-তন্ত্র** তৈরি করে। অস্থি দিয়ে তৈরী বলে ব্যাঙের কঙ্কাল-তন্ত্রকে **অস্থিতন্ত্রও** বলা হয়। দেহের কাঠামো তৈরি করা এবং নির্দিষ্ট আকার বজায় রাখা ছাড়া মস্তিষ্ক, সুষুম্নাকাণ্ড, হৃৎপিণ্ড, ফুস্ফুস ইত্যাদি দেহের ভিতরের কোমল অঙ্গকে রক্ষা করে। বিভিন্ন অস্থির সঙ্গে নানারকম পেশী যুক্ত থাকায় এই অঙ্গতন্ত্র গমনেও সাহায্য করে।

কুনো ব্যাঙের অস্থিতন্ত্র অথবা কঙ্কাল-তন্ত্রের দুটি প্রধান ভাগ—অক্ষীয় কঙ্কাল এবং উপাঙ্গিক কঙ্কাল।

**অক্ষীয় কঙ্কাল ঃ** কঙ্কালের যে অংশ দেহের মধ্যরেখা-বরাবর অবস্থিত, তাকে **অক্ষীয় কঙ্কাল** বলে। অক্ষীয় কঙ্কাল আবার করোটি এবং মেরুদণ্ড নিয়ে গঠিত।

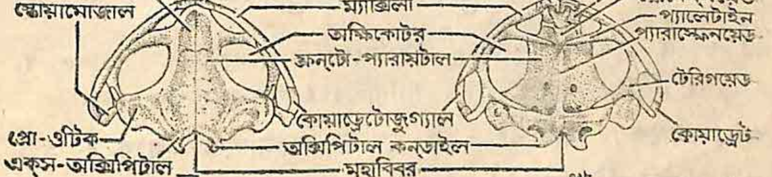
**করোটি ঃ** অক্ষীয় কঙ্কালের যে অংশ মস্তিষ্কের কাঠামো প্রস্তুত করে, তাকে **করোটি** বলে। (1) করোটিকা, (2) দুটি ন্যাজাল ক্যাপ্সুল (Nasal capsules), (3) দুটি ওটিক (Otic) ক্যাপ্সুল, (4) উপরের চোয়াল, (5) নিচের চোয়াল এবং (6) হাইঅয়েড (Hyoid) যন্ত্র নিয়ে করোটি তৈরী হয়।

করোটির মাঝামাঝি জায়গায় অবস্থিত যে নলাকার অংশের মধ্যে মস্তিষ্ক থাকে, তাকে **করোটিকা** বলে। এর পিছনদিকে **মহাবিবর** নামের একটি বড় ছিদ্র থাকে। এই ছিদ্রের মধ্য দিয়ে মস্তিষ্ক সুষুম্না-কাণ্ডের সঙ্গে মিলিত হয়। মহাবিবরের দুপাশে **এক্স-অক্সিপিটাল** (Ex-occipitals) নামের দুটি অস্থি দিয়ে তৈরী দুটি উত্তল অংশ

থাকে। এদের নাম **অক্সিপিটাল কন্‌ডাইল** (Occipital condyles)। কন্‌ডাইল ছুটির সাহায্যে করোটি মেরুদণ্ডের প্রথম কশেরুকার ছুটি অবতল অংশের সঙ্গে যুক্ত থাকে। করোটির ছাদ **ফ্রন্‌টো-প্যারায়টাল** (Fronto-parietals) নামের একজোড়া পাতের মতো অস্থি দিয়ে তৈরী। করোটিকার মেঝে তৈরী হয় ছোরার মতো দেখতে **প্যারাস্ফেনয়েড** (Parasphenoid) নামের অস্থি দিয়ে। করোটিকার সামনের দিকে আংটির মতো **স্ফেনেথ্‌ময়েড** (Sphenethmoid) নামের একটি অস্থি থাকে।

করোটিকার সামনের দিকে অবস্থিত যে ছুটি ছোট প্রকোষ্ঠের মধ্যে ঘ্রাণেন্দ্রিয় থাকে, তারাই **ন্যাজাল ক্যাপ্‌সুল** বা **অলফ্যাক্‌টারি** (Olfactory) **ক্যাপ্‌সুল**। ন্যাজাল ক্যাপ্‌সুল ছুটির ছাদ ও মেঝে তৈরী হয় যথাক্রমে ছুটি করে **ন্যাজাল** (Nasals) ও **ভোমার** (Vomers) নামের অস্থি দিয়ে।

করোটিকার পিছনের অংশের ছুপাশ **ওটিক ক্যাপ্‌সুল** বা **অডিটরি** (Auditory) **ক্যাপ্‌সুল** ছুটি থাকে। এরা প্রধানতঃ **প্রো-ওটিক** (Pro-otic) নামের ছুটি অস্থি দিয়ে গঠিত।

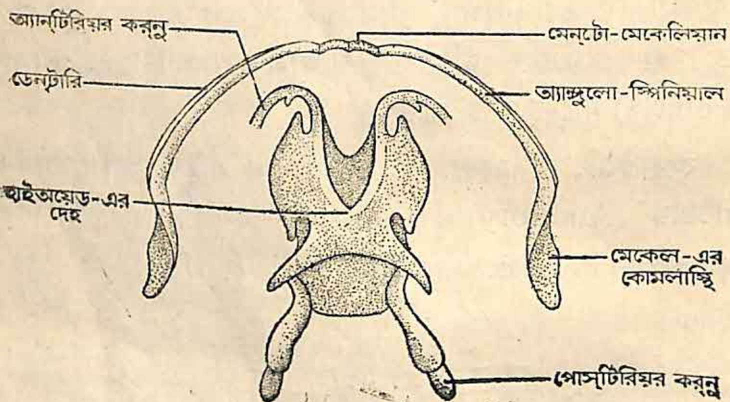



41 নং চিত্র— কুনো ব্যাঙের করোটি : ক. পৃষ্ঠদৃশ্য ; খ. অঙ্কদৃশ্য।

করোটির মুখ-বিবর-সংলগ্ন অঞ্চলের পৃষ্ঠদেশের পরিধি-বরাবর অবস্থিত অংশকে **উপরের চোয়াল** বলে। উপরের চোয়াল বাইরের দিকে একসারি এবং ভিতরের দিকে একসারি অস্থি দিয়ে গঠিত। বাইরের সারিতে তিনজোড়া অস্থি থাকে। এদের মধ্যে সামনের দিকে

অবস্থিত অস্থি জোড়াটির নাম **প্রি-ম্যাক্সিলা** (Pre-maxillae)। প্রি-ম্যাক্সিলা দুটি পাশাপাশি লেগে থাকে। এদের পরে থাকে **ম্যাক্সিলা** (Maxillae)। ম্যাক্সিলার পিছনে থাকে **কোয়াড্রেটো-জুগ্যাল** (Quadratojugals)। ভিতরের সারির অস্থিগুলি সামনের দিক থেকে পিছনের দিকে যথাক্রমে **প্যালেটাইন** (Palatines), **টেরিগয়েড** (Pterygoids), এবং **কোয়াড্রেট** (Quadrates)। কোয়াড্রেট-এর সঙ্গে **স্কোয়ামোজাল** (Squamosals) নামের অন্য একটি ছোট অস্থি আট্‌কানো থাকে।

করোটির মুখ-বিবর-সংলগ্ন অঞ্চলের অঙ্কদেশের পরিধি-বরাবর অবস্থিত অংশকে **নিচের চোয়াল** বলে। নিচের চোয়ালে মোট তিনজোড়া




42 নং চিত্র — (সামনে) কুনো ব্যাঙের নিচের চোয়ালের অস্থি ও কোমলাস্থি, এবং (পিছনে) হাইঅয়েড যন্ত্র (অ্যান্‌টিরিয়র করনু আংশিক কাটা)।

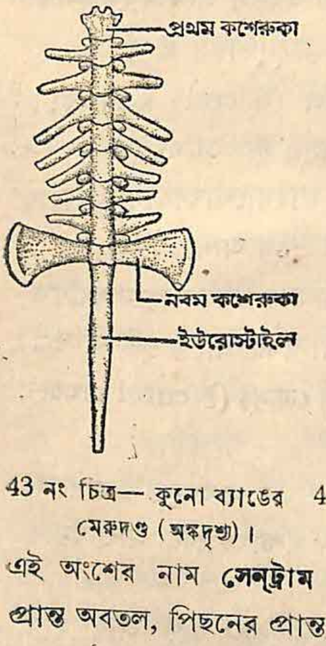
অস্থি থাকে। সামনের দিক থেকে পিছনদিকে যথাক্রমে এরা **মেন্টো-মেকেলিয়ান** (Mento-meckelians) এবং ভিতরের প্রান্ত-বরাবর অবস্থিত **অ্যাঙ্গুলো-স্প্লিনিয়াল** (Angulo-splenials) ও বাইরের প্রান্ত-বরাবর অবস্থিত ডেন্টারি (Dentaries)। নিচের চোয়ালের পিছনের অংশের বাইরের দিকে **মেকেল-এর কোমলাস্থি** (Meckel's cartilage) নামের কোমলাস্থি থাকে।

মুখ-বিবরের মেঝেয় যে পাতের মতো কোমলাস্থি থাকে, তারই নাম **হাইঅয়েড যন্ত্র**। এর সঙ্গে জিহ্বা লেগে থাকে। এর চওড়া

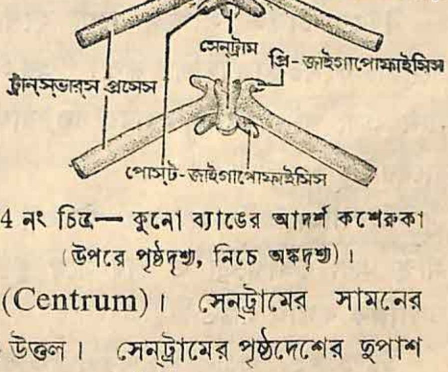
মাঝের অংশের নাম **হাইঅয়েড-এর দেহ**। এই অংশের সামনের দিকের দুপাশ থেকে দুটি সরু ও বাঁকা অংশ ওটিক ক্যাপ্‌সুল পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। এদের নাম **অ্যান্‌টিরিয়র কর্‌নু** (Anterior cornu)। তেমনিভাবে, হাইঅয়েড-এর দেহের পিছনদিকের দুপাশ থেকে দুটি অল্প মোটা অংশ উৎপন্ন হয়ে, ল্যারিঙ্গো-ট্রাকিয়াল প্রকোষ্ঠের দুপাশ পর্যন্ত চলে যায়। এদের বলে **পোস্‌টিরিয়র** (Posterior) **কর্‌নু**।

**মেরুদণ্ড ঃ** করোটির পিছনদিক থেকে ধড়ের শেষপ্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত দেহাংশের পৃষ্ঠ-মধ্যরেখা-বরাবর **শিরদাঁড়া** থাকে। বিজ্ঞানের ভাষায় এরই নাম **মেরুদণ্ড**। মোটামুটি আংটির মতো নটি **কশেরুকা** নামের অস্থি-খণ্ড এবং শেষ কশেরুকার পিছনের প্রান্তের সঙ্গে যুক্ত **ইউরোস্টাইল** (Urostyle) নামের অস্থি-দণ্ড দিয়ে কুনো ব্যাঙের মেরুদণ্ড তৈরী হয়। তেত্রিশ অথবা চৌত্রিশটি কশেরুকা নিয়ে মানুষের মেরুদণ্ড তৈরী হয়।

দ্বিতীয় থেকে অষ্টম কশেরুকার গঠন মোটামুটি একই রকমের। এরা **আদর্শ কশেরুকা** নামে পরিচিত। এদের অঙ্কভাগ বেলনাকার ও নিরেট।




43 নং চিত্র— কুনো ব্যাঙের মেরুদণ্ড (অঙ্কদৃশ্য)।




44 নং চিত্র— কুনো ব্যাঙের আদর্শ কশেরুকা (উপরে পৃষ্ঠদৃশ্য, নিচে অঙ্কদৃশ্য)।

এই অংশের নাম **সেন্‌ট্রাম** (Centrum)। সেন্‌ট্রামের সামনের প্রান্ত অবতল, পিছনের প্রান্ত উত্তল। সেন্‌ট্রামের পৃষ্ঠদেশের দুপাশ থেকে দুটি পাতের মতো অংশ উৎপন্ন হয়ে পৃষ্ঠ-মধ্যরেখা-বরাবর পরস্পর

মিলিত হয়। ফলে, সেন্ট্রামের পৃষ্ঠদেশে যে খিলান সৃষ্টি হয়, তার নাম **নিউরাল আর্চ** (Neural arch)। এইভাবে, নিউরাল আর্চ ও সেন্ট্রামের মাঝামাঝি অঞ্চলে যে গহ্বর সৃষ্টি হয়, তাকে বলে **নিউরাল ক্যানাল** (Neural canal)। এর মধ্যে সুষুম্নাকাণ্ড থাকে। নিউরাল আর্চের পৃষ্ঠ-মধ্যরেখা-বরাবর যে উঁচু অঞ্চল থাকে, তার নাম **নিউরাল স্পাইন** (Neural spine)। নিউরাল আর্চের দুপাশে দুটি দণ্ডের মতো অংশ লেগে থাকে। এরা **ট্রান্স্ভার্স প্রসেস** (Transverse processes)। নিউরাল আর্চের সামনের প্রান্তের দুপাশে দুটি ঊর্ধ্বমুখী, এবং পিছনের প্রান্তের দুপাশে দুটি নিম্নমুখী চামচের মতো অংশ থাকে। এদের যথাক্রমে **প্রি-জাইগাপোফাইসেস** (Pre-zygapophyses) এবং **পোস্ট্-জাইগাপোফাইসেস** (Post-zygapophyses) বলা হয়।

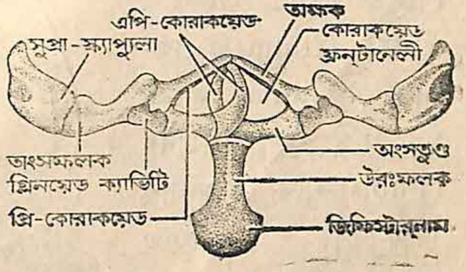
প্রথম কশেরুকাকে **অ্যাট্লাস** (Atlas) বলা হয়। এটি আংটির মতো। এর সেন্ট্রামের সামনের প্রান্তে দুটি অবতল অংশ থাকে। এই কশেরুকার প্রি-জাইগাপোফাইসেস এবং ট্রান্স্ভার্স প্রসেস থাকে না। নবম কশেরুকার অন্য নাম **স্যাক্রাল** (Sacral) **কশেরুকা**। এটি সব থেকে বড়। এর ট্রান্স্ভার্স প্রসেস দুটি চ্যাপ্টা ও হাত-পাখার মতো। এই কশেরুকার পোস্ট-জাইগাপোফাইসেস থাকে না। এর সেন্ট্রামের পিছনের প্রান্তে দুটি উত্তল অংশ থাকে।

**ইউরোস্টাইল** আসলে নবম কশেরুকার পিছনদিকে অবস্থিত কয়েকটি কশেরুকার মিলিত রূপ। এর সামনের প্রান্তে দুটি অবতল অংশ এবং পৃষ্ঠ-মধ্যরেখা-বরাবর **নিউরাল ক্রেস্ট** (Neural crest) নামের উঁচু অংশ থাকে।

**উপাঙ্গিক কঙ্কাল :** উরশ্চক্র ও এর সঙ্গে যুক্ত অগ্রপদের অস্থি এবং শ্রোণীচক্র ও তার সঙ্গে যুক্ত পশ্চাৎ-পদের অস্থি নিয়ে **উপাঙ্গিক কঙ্কাল** গঠিত।

**উরশ্চক্র :** অগ্রপদ-বরাবর ধড়কে প্রায় বেষ্টন করে অস্থি দিয়ে তৈরী একটি কাঠামো দেখা যায়। এটি কুনো ব্যাঙের **উরশ্চক্র**।

উরশ্চক্র প্রায় সমান দুটি অর্ধেক অংশে বিভক্ত। এর ভাগ দুটি বুকের দিকে পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হয়, কিন্তু পিঠের দিকে এরা আলাদা থাকে। প্রত্যেক ভাগে ছটি করে অস্থি থাকে। মেরুদণ্ডের পাশের দিকে চওড়া পাতের মতো অংশের নাম **সুপ্রা-স্ক্যাপুলা** (Supra-scapula)। সুপ্রা-স্ক্যাপুলার সঙ্গে যুক্ত এবং ধড়ের পাশের দিকে অবস্থিত

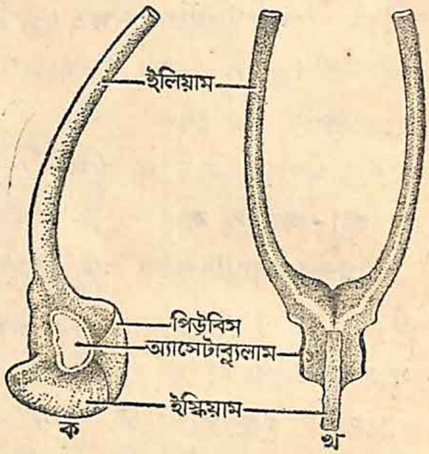



45 নং চিত্র—কুনো ব্যাঙের উরশ্চক্র।

অংশের নাম **অংসফলক**। অংসফলকের নিচের প্রান্তের সঙ্গে যুক্ত
দণ্ডের মতো দুটি অস্থি থাকে। এদের মধ্যে সামনের দিকেরটির
নাম **অক্ষক** এবং পিছনের দিকেরটির নাম **অংসতুণ্ড**। অক্ষক এক
খণ্ড লম্বা কোমলাস্থিকে কিছুটা ঢেকে রাখে। এই কোমলাস্থির
নাম **প্রি-কোরাকয়েড** (Pre-coracoid)। অক্ষক এবং অসংতুণ্ডের
অন্য প্রান্ত কাস্তের মতো বাঁকা একটি কোমলাস্থির সঙ্গে যুক্ত থাকে।
এর নাম **এপি-কোরাকয়েড** (Epi-coracoid)। অক্ষক ও অংস-
তুণ্ডের মাঝে যে বড় ফাঁক থাকে, তার নাম **কোরাকয়েড ফ্রণ্টানেলী**
(Coracoid frontanelle)। অংসফলক, অক্ষক এবং অংসতুণ্ডের
সংযোগ-স্থলে একটি অবতল অংশ থাকে। এর নাম **গ্লিনয়েড ক্যাভিটি**
(Glenoid cavity)। এপি-কোরাকয়েড দুটির সংযোগ-স্থলের
পিছনের প্রান্তের সঙ্গে একটি চ্যাপ্টা ও লম্বা অস্থি-খণ্ড যুক্ত থাকে।
এর নাম **উরঃফলক**। উরঃফলকের সঙ্গে এক খণ্ড চ্যাপ্টা ও অর্ধ-
বৃত্তাকার কোমলাস্থি লাগানো থাকে। এর নাম **জিফিস্টারনাম**
(Xiphisternum)। অগ্রপদের অস্থি ধারণ করা এবং হৃৎপিণ্ড ও
ফুসফুসকে রক্ষা করে উরশ্চক্রের প্রধান কাজ।

**শ্রোণীচক্র** : কুনো ব্যাঙের শ্রোণীচক্র V-আকৃতির। এর বাহু
দুটি নবম কশেরুকার ট্রান্স্ভার্স প্রসেস দুটির সঙ্গে আটকানো

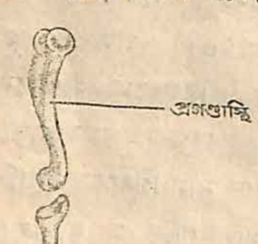
থাকে। শ্রোণীচক্রেরও দুটি ভাগ। প্রত্যেক ভাগে তিনটি করে অস্থি থাকে। শ্রোণীচক্রের পিছনের দিক কতকটা চাক্তির মতো। এই অংশ **ইলিয়াম** (Ilium) ও **ইস্কিয়াম** (Ischium) নামের দুটি অস্থি এবং **পিউবিস** (Pubis) নামের কোমলাস্থি দিয়ে তৈরী। V-এর বাহু-ও ইলিয়াম দিয়ে তৈরী।




46 নং চিত্র— কুনো ব্যাঙের শ্রোণীচক্র : ক. পার্শ্বদৃশ্য ; খ. পৃষ্ঠদৃশ্য।

চাক্তির মতো অংশের কেন্দ্রে **অ্যাসেটাব্যুলাম** (Acetabulum) নামের অবতল অঞ্চল থাকে। পশ্চাৎ-পদের অস্থি ধারণ করা শ্রোণীচক্রের কাজ।

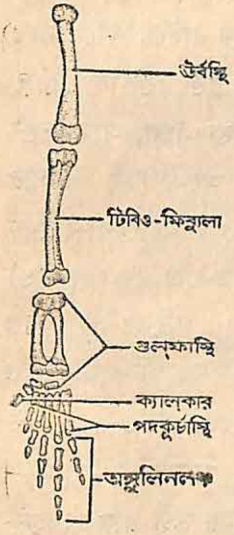
**অগ্রপদের অস্থি :** অগ্রপদের প্রগণ্ডের ভিতরে যে লম্বা এবং অল্প বাঁকা দণ্ডের মতো অস্থি থাকে, তার নাম **প্রগণ্ডাস্থি**। এর সামনের প্রান্তে একটি ফোলা অংশ থাকে। এই অংশটি উরশ্চক্রের গ্লিনয়েড ক্যাভিটির মধ্যে আটকানো থাকে। প্রগণ্ডাস্থির অপর প্রান্তে কপিকলের মতো একটি ফোলা অংশ থাকে। এই অংশের সাহায্যে প্রগণ্ডাস্থি প্রকোষ্ঠের অস্থির সঙ্গে যুক্ত থাকে। ব্যাঙের প্রকোষ্ঠের অস্থির নাম **রেডিও-আল্না** (Radio-ulna)। এটিও দণ্ডের মতো। কুনো ব্যাঙের মণিবন্ধে মোট ছটি অস্থি দুসারিতে সাজানো থাকে। এদের নাম **মণিবন্ধাস্থি**। করতলে চারটি সরু ও লম্বা অস্থি থাকে।




47 নং চিত্র— কুনো ব্যাঙের অগ্রপদের অস্থি।

এদের নাম **করকূর্চাস্থি**। কুনো ব্যাঙের অগ্রপদের প্রথম ও দ্বিতীয় আঙুলে দুটি করে, এবং তৃতীয় ও চতুর্থ আঙুলে তিনটি করে ছোট দণ্ডের মতো অস্থি থাকে। এদের নাম **অঙ্গুলিনলক**।

**পশ্চাৎ-পদের অস্থি ঃ** উরুর মধ্যের অস্থির নাম **উর্বস্থি**। এটি লম্বা ও অল্প বাঁকা দণ্ডের মতো। এর-ও দুই প্রান্ত ফোলা। সামনের প্রান্তের ফোলা অংশটি শ্রোণীচক্রের অ্যাসেটাব্যুলামের মধ্যে আটকানো থাকে। পিছনের প্রান্তের ফোলা অংশটির সাহায্যে উর্বস্থি জঙ্ঘার অস্থির সঙ্গে যুক্ত থাকে। জঙ্ঘার অস্থির নাম **টিবিও-ফিব্যুলা** (Tibio-fibula)। এটিও দণ্ডের মতো এবং দুপ্রান্তে ফোলা। টিবিও-ফিব্যুলা গুল্‌ফ-এর অস্থির সঙ্গে যুক্ত থাকে। গুল্‌ফে চারটি অস্থি-খণ্ড দুসারিতে সাজানো থাকে। প্রথম সারির দুটি লম্বা, দ্বিতীয় সারির দুটি ছোট। এই অস্থি-খণ্ড চারটির নাম **গুল্‌ফাস্থি**। কুনো ব্যাঙের পায়ে পাঁচটি সরু লম্বা অস্থি থাকে। এদের নাম **পদকূর্চাস্থি**। কুনো ব্যাঙের পশ্চাৎ-পদের পাঁচটি অঙ্গুলিতে যে ছোট ছোট অস্থি থাকে, তাদের নাম **অঙ্গুলিনলক**। প্রথম ও দ্বিতীয় অঙ্গুলিতে দুটি করে, তৃতীয় ও পঞ্চম অঙ্গুলিতে তিনটি করে এবং চতুর্থ অঙ্গুলিতে চারটি অস্থি-খণ্ড থাকে। প্রথম অঙ্গুলির ভিতরের দিকে একটি লম্বাটে অংশ থাকে। এর নাম **ক্যাল্‌কার** (Calcar)। এতে দুটি খুব ছোট অস্থি-খণ্ড থাকে।




48 নং চিত্র— কুনো ব্যাঙের পশ্চাৎ-পদের অস্থি।

এই পরিচ্ছেদে যে দুটি অমেরুদণ্ডী প্রাণীর অঙ্গতন্ত্রের বিবরণ দেওয়া হয়েছে, তার থেকে মেরুদণ্ডী ও অমেরুদণ্ডী প্রাণীর কয়েকটি গঠনগত পার্থক্য সহজেই জানা যায়। যেমন— মেরুদণ্ডী প্রাণীর কঙ্কাল দেহের ভিতরে থাকে এবং প্রধানতঃ অস্থি দিয়ে তৈরী। কিন্তু,

আরসোলা প্রভৃতি অমেরুদণ্ডী প্রাণীর দেহের কাঠামো (অর্থাৎ কঙ্কাল) তৈরী হয় দেহের বাইরের তলে অবস্থিত **কিউটিক্‌ল** (Cuticle) নামের পদার্থের আবরণ দিয়ে। মেরুদণ্ডী প্রাণীর হৃৎপিণ্ড দেহের অঙ্কভাগের দিকে থাকে। কিন্তু, আরসোলা এবং অন্যান্য অধিকাংশ অমেরুদণ্ডী প্রাণীর হৃৎপিণ্ড দেহের পৃষ্ঠভাগের দিকে থাকে। মেরুদণ্ডী প্রাণীর রক্ত কখনই রক্তবাহর বাইরে আসে না। কিন্তু, আরসোলা এবং অন্যান্য অমেরুদণ্ডী প্রাণীর রক্ত রক্তবাহ ছেড়ে, দেহ-গহ্বরে চলে আসে। মেরুদণ্ডী প্রাণীর রক্ত লাল, অমেরুদণ্ডী প্রাণীর রক্ত লাল নয় (কেঁচো ব্যতিক্রম)। অমেরুদণ্ডী প্রাণীর মস্তিষ্ক ও নার্ভ-সূত্র নিরেট, নার্ভ-সূত্র দেহের অঙ্ক-মধ্যরেখা-বরাবর থাকে। কিন্তু, মেরুদণ্ডী প্রাণীর মস্তিষ্ক ও নার্ভ-সূত্র (সুষুম্নাকাণ্ড) ফাঁপা এবং দেহের পৃষ্ঠ-মধ্যরেখা-বরাবর থাকে। গঠনের পার্থক্যের সঙ্গে সঙ্গে, মেরুদণ্ডী ও অমেরুদণ্ডী প্রাণীর জীবনযাপন-পদ্ধতিতেও কম-বেশি পার্থক্য দেখা যায়। পার্থক্য থাকলেও, মেরুদণ্ডী ও অমেরুদণ্ডী প্রাণীদের অঙ্গতন্ত্র-ব্যবস্থায় মিলও অনেক। যেমন— এদের সবাইয়ের পুষ্টির জন্য পুষ্টিতন্ত্র, রক্ত-সংবহনের জন্য রক্ত-সংবহন-তন্ত্র, জননের জন্য জনন-তন্ত্র ইত্যাদি আছে।

## অনুশীলনী

1. আরসোলার পৌষ্টিক নালীর ছবি এঁকে, বিভিন্ন অংশ চিহ্নিত কর, এবং কোন অংশের কি কাজ, তা উল্লেখ কর।

2. আরসোলার নিচে লিখিত অঙ্গগুলির অবস্থান, গঠন ও কাজ উল্লেখ কর :—
(ক) হৃৎপিণ্ড ; (খ) শুক্রাশয় ; (গ) শুক্রথলি ; (ঘ) কংগ্লোবেট গ্রন্থি ; (ঙ) ডিম্বাশয় ; (চ) কোলেটেরিয়াল গ্রন্থি ; (ছ) শুক্রধানী।

3. কেঁচোর নিচে লেখা অঙ্গগুলির অবস্থান, গঠন ও কাজ উল্লেখ কর :—
(ক) হৃৎপিণ্ড ; (খ) ডিম্বাশয় ; (গ) শুক্রাশয় ; (ঘ) প্রোস্টোমিয়াম ; (ঙ) গিজার্ড ; (চ) পাকস্থলী ; (ছ) শুক্রধানী।

4. কেঁচোর পৌষ্টিক নালীর ছবি এঁকে, বিভিন্ন অংশ চিহ্নিত কর, এবং চিহ্নিত অংশগুলির কাজ উল্লেখ কর।

5. কেঁচোর দেহের সামনের অংশের এবং মাঝের অংশের রক্তবাহগুলির ছবি এঁকে, চিহ্নিত কর। তীরচিহ্ন দিয়ে, কোন রক্তবাহর মধ্য দিয়ে কোন-দিকে রক্ত প্রবাহিত হয়, তা দেখাও।

6. কেঁচোর জনন-অঙ্গগুলির ছবি এঁকে, চিহ্নিত কর। কোন অঙ্গ কোন দেহ-খণ্ডকে থাকে, তা ছবিতে স্পষ্ট করে দেখাও।

7. আরসোলা এবং কেঁচোর নার্ভ-তন্ত্রের ছবি পাশাপাশি এঁকে, বিভিন্ন অংশ চিহ্নিত কর। এই দুটি প্রাণীর নার্ভ-তন্ত্রের প্রধান প্রধান সাদৃশ্যগুলি উল্লেখ কর।

8. কুনো ব্যাঙের পৌষ্টিক তন্ত্রের ছবি আঁক এবং বিভিন্ন অংশ চিহ্নিত কর। চিহ্নিত প্রতিটি অংশের কাজ উল্লেখ কর।

9. কুনো ব্যাঙের শ্বসনের সঙ্গে জড়িত অঙ্গগুলির নাম কর, এবং এদের কাজ সম্বন্ধে লেখ।

10. কুনো ব্যাঙের হৃৎপিণ্ডের ছবি এঁকে, বিভিন্ন অংশ চিহ্নিত কর।

11. কুনো ব্যাঙের হৃৎপিণ্ডের দীর্ঘচ্ছেদের ছবি এঁকে, বিভিন্ন অংশ চিহ্নিত কর, এবং তীরচিহ্ন দিয়ে হৃৎপিণ্ডের মধ্য দিয়ে, রক্ত-সংবহনের পথ নির্দেশ কর।

12. কুনো ব্যাঙের দেহের অগ্রভাগের ধমনীগুলির ছবি এঁকে, চিহ্নিত কর।

13. কুনো ব্যাঙের পোর্টাল শিরাগুলির ছবি এঁকে, চিহ্নিত কর।

14. স্ত্রী-কুনো ব্যাঙের রেচন-তন্ত্রের ছবি আঁক, এবং বিভিন্ন অঙ্গ চিহ্নিত কর।

15. পুরুষ-কুনো ব্যাঙের জনন-তন্ত্রের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও এবং চিহ্নিত ছবি আঁক।

16. কুনো ব্যাঙের মস্তিষ্কের ছবি এঁকে, বিভিন্ন অংশ চিহ্নিত কর, এবং কোন অংশের কি কাজ, তা উল্লেখ কর।

17. কুনো ব্যাঙের উরশ্চক্রের ছবি এঁকে, বিভিন্ন অংশের নাম লেখ। উরশ্চক্রের কাজ কি?

18. নিচের বাক্যগুলির মধ্যে যেটি ঠিক, তার পাশে 'হ্যাঁ' এবং যেটি ভুল, তার পাশে 'না' লেখ :—

(ক) আরসোলার নার্ভ-সূত্রে দশ জোড়া নার্ভ-গ্রন্থি থাকে; (খ) পাচক রস নিঃসরণ করা আন্ত্রিক সিকার কাজ; (গ) রক্তকণিকায় হিমোগ্লোবিন থাকে বলে, কেঁচোর রক্তের রঙ লাল; (ঘ) কেঁচোর শুক্রাশয়ের সংখ্যা একজোড়া; (ঙ) কুনো ব্যাঙের জিহ্বার মুক্ত-প্রান্ত ভিতরের দিকে থাকে বলে, এর কোনও কাজ নেই; (চ) কুনো ব্যাঙের ক্লোমনালিকা নেই; (ছ) কুনো ব্যাঙের হৃৎপিণ্ডে পাঁচটি প্রকোষ্ঠ আছে; (জ) পুরুষ-কুনো ব্যাঙের গবিনীর মধ্য দিয়ে মূত্র এবং শুক্রাণু বাহিত হয়; (ঝ) দশটি কশেরুকা নিয়ে কুনো ব্যাঙের মেরুদণ্ড তৈরী হয়।

19. শূন্যস্থান পূরণ কর :—

(ক) ভেন্‌ট্রিকুলাস আরসোলার — তন্ত্রের একটি অঙ্গের নাম; (খ) আরসোলার বক্ষ-শ্বাসছিদ্রের সংখ্যা — জোড়া; (গ) — সংখ্যক দেহ-খণ্ডকে কেঁচোর আন্ত্রিক সিকা থাকে; (ঘ) কেঁচোর "হৃৎপিণ্ডের" সংখ্যা — জোড়া; (ঙ) কেঁচোর দেহে — জোড়া শুক্রধানী থাকে; (চ) অক্সিজেন-যুক্ত উজ্জ্বল লাল রঙের রক্ত বহন করে — নামের রক্তবাহ; (ছ) কুনো ব্যাঙের দেহে —টি মহাশিরা আছে; (জ) কুনো ব্যাঙের করোটিক নার্ভের সংখ্যা — জোড়া; (ঝ) কুনো ব্যাঙের শ্রোণীচক্রে — জোড়া অস্থি ও কোমলাস্থি আছে।

# উদ্ভিদ-দেহে ব্যাপন, আস্রবণ, শোষণ, পরিবহণ ও বাষ্পমোচন 5

উদ্ভিদ ও প্রাণীরা শ্বসনের সময় পরিবেশ থেকে নিজেদের দেহে অক্সিজেন গ্যাস গ্রহণ করে এবং দেহ থেকে পরিবেশে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস বের করে দেয়। উদ্ভিদেরা মূল দিয়ে মাটি থেকে জল শোষণ করে এবং সেই জল ক্রমে কাণ্ডের মধ্য দিয়ে পত্রে পৌঁছায়। প্রয়োজনের অতিরিক্ত জল উদ্ভিদেরা বাষ্প আকারে দেহ থেকে বের করে দেয়। প্রাণীদের অতিরিক্ত জল ঘর্ম ও মূত্র হিসাবে দেহের বাইরে চলে আসে। ঠিক কিভাবে এই সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ শারীরবৃত্তীয় ক্রিয়া সম্ভব হয়, সেবিষয়ে জ্ঞানলাভ করা জীবন-বিজ্ঞানের অন্যতম আলোচ্য বিষয়। উদ্ভিদেরা কিভাবে (ক) কার্বন ডাই-অক্সাইড ও অক্সিজেন গ্যাস এবং জল ও খনিজ লবণের দ্রবণ শোষণ করে, (খ) শোষিত পদার্থ পরিবহণ করে, এবং (গ) জলীয় বাষ্প, অক্সিজেন ও কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস ত্যাগ করে, সেইসব বিষয়ে এই পরিচ্ছেদে আলোচনা করা হল। এই সমস্ত প্রক্রিয়ায় ব্যাপন ও আস্রবণ কোথায়, কিভাবে কাজে লাগে, সেবিষয়েও সাধারণভাবে আলোচনা করা হল।

**ব্যাপন**: বড় ঘরের এক কোণে ধূপ জ্বালালে, প্রথমে ধূপের কাছাকাছি জায়গায় ধূপের গন্ধ পাওয়া যায়; কিন্তু, ঘরের অন্য কোণে কোনও গন্ধ পাওয়া যায় না। ধূপ জ্বালার সঙ্গে সঙ্গে ধূপের কাছাকাছি জায়গায় ধোঁয়ার পরিমাণ বেশি অর্থাৎ, ধোঁয়ার ঘনত্ব বেশি, কিছুটা দূরে ধোঁয়ার ঘনত্ব কম থাকে; ধূপ থেকে অনেক দূরে ধোঁয়া আদৌ থাকে না। সেইজন্য, ধূপের কাছে বেশি, এবং একটু দূরে কম গন্ধ পাওয়া যায়; কিন্তু, অনেক দূরে গন্ধ আদৌ পাওয়া যায় না। ক্রমে ধূপের ধোঁয়ায় সমস্ত ঘর ভরে যায়। তখন ঘরের যে-কোনও জায়গায় থাকলে, ধূপের গন্ধ পাওয়া যায়। এইভাবে ঘরের বায়ুতে ধূপের ধোঁয়া আস্তে আস্তে ছড়িয়ে পড়াকে **ব্যাপন** বলা হয়। এক গ্লাস জলে এক

টুক্‌রা তুঁতের কেলাস ফেলে দিয়ে, কয়েক ঘণ্টা অপেক্ষা করলে দেখা যায় যে, গ্লাসের জল নিচের দিক থেকে উপরের দিকে ক্রমেই নীল রঙের হয়ে যাচ্ছে। ব্যাপনের ফলেই এইরকম সম্ভব হয়। তুঁতে জলে দ্রাব্য (অর্থাৎ, জলে গুলে যায়)। জলে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তুঁতে চারপাশের জলে দ্রবীভূত হতে থাকে। কাজেই, প্রথমে কেলাসের চারপাশে তুঁতের ঘন দ্রবণ তৈরী হয়। এই তুঁতের দ্রবণের ঘনত্ব জলের চেয়ে বেশি বলে, তুঁতের দ্রবণ জলের সঙ্গে মিশে গিয়ে, তুঁতের দ্রবণ এবং জলের ঘনত্ব সমান করতে চায়। এইভাবে তুঁতের দ্রবণ ক্রমেই গ্লাসের জলের উপরের দিকে চলে আসতে থাকে। এদিকে তুঁতের কেলাস আরও বেশি করে জলে দ্রবীভূত হতে থাকায়, শেষ পর্যন্ত গ্লাসের সমস্ত জলই নীল রঙের হয়ে যায়।

অতএব, **যদি দুটি বিভিন্ন ঘনত্বের গ্যাসীয় অথবা তরল পদার্থ একসঙ্গে রাখা যায়, তাহলে যে প্রক্রিয়ায় ঐ দুটি পদার্থের ঘনত্ব সমান হয়, তাকে ব্যাপন বলে।** ব্যাপনের সময় বেশি ঘনত্বের পদার্থ (ধূপের ধোঁয়া, তুঁতের দ্রবণ) কম ঘনত্বের পদার্থ(বায়ু, জল)-এর দিকে যেতে থাকে। ফলে, বেশি ঘনত্ব-যুক্ত পদার্থের ঘনত্ব কমতে থাকে এবং কম ঘনত্ব-যুক্ত পদার্থের ঘনত্ব বাড়তে থাকে। দুটি পদার্থের ঘনত্ব সমান না হওয়া পর্যন্ত, ব্যাপন চলতে থাকে।

আস্রবণ : ধূলা-বালি মেশানো চিনির জল কিংবা নুন-জল পাতলা কাপড় দিয়ে ছেঁকে নিলে, ছেঁকা চিনির জল বা নুন-জলে ধূলা-বালি থাকে না। কারণ, ধূলা-বালির কণা কাপড়ের সূক্ষ্ম ছিদ্রের ভিতর দিয়ে যেতে পারে না, কিন্তু নুন বা চিনির দ্রবণ যেতে পারে।* কাপড়, চোষ-কাগজ, পরিস্রুতি-কাগজ ইত্যাদির সূক্ষ্ম ছিদ্রের মধ্য দিয়ে কঠিন পদার্থের কণা যেতে না পারলেও, নুন, চিনি, তুঁতে

* চিনি জলে গুললে, চিনির জলীয় দ্রবণ তৈরী হয়। যে বস্তু গোলা হয়, তাকে বলে **দ্রাব্য**, এবং যাতে গোলা হয়, তাকে বলা হয় **দ্রাবক**। চিনির জলীয় দ্রবণে চিনি দ্রাব্য, জল দ্রাবক। দ্রবণে দ্রাব্যের (চিনির) অণুগুলি দ্রাবকের (জলের) মধ্যে মোটামুটি স্বাধীনভাবে চলাফেরা করে।

ইত্যাদির দ্রবণ যেতে পারে। কাপড়, চোষ-কাগজ, পরিস্রুতি-কাগজ ইত্যাদির ভিতর দিয়ে সমস্ত তরল দ্রবণ অনায়াসে যেতে পারে বলে, এদের বলা **হয় ভেদ্য পর্দা**।

মাছের পট্‌কা, ডিমের খোলার ভিতরের পর্দা, সেলোফেন (Cellophane) নামের স্বচ্ছ কাগজ, পার্চমেন্ট (Parchment) কাগজ ইত্যাদির ধর্ম এমন যে, এদের মধ্য দিয়ে দ্রাবকের অণু স্বচ্ছন্দে যেতে পারে, কিন্তু দ্রাব্যের অণু খুব অল্প পরিমাণে যেতে পারে, অথবা আদৌ যেতে পারে না। সেইজন্য, এদের **আভেদ্য পর্দা** বলা হয়।

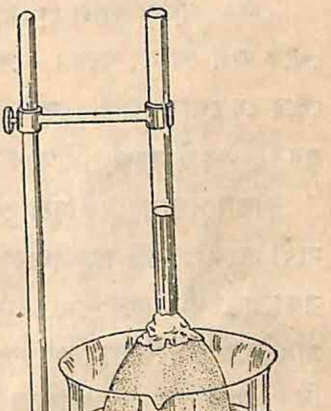
যদি বিভিন্ন ঘনত্বের দুটি দ্রবণকে আভেদ্য পর্দা দিয়ে পৃথক করে রাখা যায়, তবে বেশ কিছুক্ষণ পরে দেখা যায় যে, দুটি দ্রবণেরই ঘনত্ব সমান হয়ে গেছে। যে দ্রবণের ঘনত্ব কম, সেই দ্রবণটি আভেদ্য পর্দার মধ্য দিয়ে বেশি ঘনত্বের দ্রবণের দিকে যাওয়ার ফলেই, দ্রবণ দুটির ঘনত্ব সমান হয়। আস্রবণের ফলে এইরকম হয়। সুতরাং, যে **প্রক্রিয়ায় আভেদ্য পর্দা দিয়ে পৃথক করা দুটি বিভিন্ন ঘনত্বের দ্রবণের ঘনত্ব সমান হয়, তাকে আস্রবণ বলে**। নিচের পরীক্ষা থেকে আস্রবণ প্রক্রিয়াটি সহজে বোঝা যায়।

***আস্রবণের পরীক্ষা*** **:** এই পরীক্ষার জন্য লাগবে একটি করে কাচের সরু নল, বীকার (Beaker), ক্ল্যাম্প্ ও স্ট্যাণ্ড্ (Clamp and stand), ডিম, কিছু পরিমাণ পাতিত জল, চিনির গাঢ় জলীয় দ্রবণ, আল্‌তা, গাঢ় হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড (Hydrochloric acid) ও গালা।

একদিকে একটি ছোট ছিদ্র করে, ডিমের ভিতর থেকে কুসুম ও সাদা অংশ বের করে ফেলা হল। ছিদ্রের বিপরীত দিকে ডিমের অর্ধেক অংশ হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডে কিছুক্ষণ ডুবিয়ে রাখা হল। ফলে ঐ অংশের খোলা গলে গিয়ে, ভিতরের পর্দা বের হয়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে ডিমটি অ্যাসিড থেকে তুলে, পাতিত জলে ভালো করে ধুয়ে নেওয়া হল। এরপর ছিদ্রের ভিতর দিয়ে কাচের নলটি কিছুদূর পর্যন্ত

প্রবেশ করিয়ে, নল ও ডিমের সংযোগ-স্থল গালা দিয়ে ভালো করে বন্ধ করে দেওয়া হল। পাতিত জল দিয়ে বীকারটি প্রায় অর্ধেক ভর্তি করে, ঐ জলে কয়েক ফোঁটা আল্‌তা দেওয়া হল। এতে জলের রঙ লাল হয়ে গেল। এখন কাচের নলের মধ্য দিয়ে ডিমের খোলার ভিতরে চিনির দ্রবণ ঢেলে দেওয়া হল এবং ঐ অবস্থায় ডিমের খোলাকে বীকারের জলের মধ্যে ডুবিয়ে দিয়ে, কাচের নলটি ক্ল্যাম্পের সাহায্যে স্ট্যাণ্ডের সঙ্গে আট্‌কে দেওয়া হল। ডিমটি এমনভাবে জলে ডোবানো হল, যাতে পর্দার সব অংশ জলের মধ্যে ডুবে থাকে। নলের মধ্যে চিনির দ্রবণের অবস্থান দেখে রাখা হল।

বেশ কয়েক ঘণ্টা পরে দেখা গেল, কাচের নলের মধ্যে চিনির দ্রবণ লাল হয়ে গেছে এবং নলের মধ্যে জলের তল আগের জায়গা থেকে অনেক উপরে উঠে গেছে। এই পরীক্ষা থেকে বোঝা গেল যে, বীকারের লাল জল ডিমের খোলার মধ্যে প্রবেশ করেছে। এরই ফলে, চিনির দ্রবণের রঙ লাল হয়ে গেছে এবং দ্রবণের আয়তন বেড়ে গেছে।


49 নং চিত্র— আস্রবণের পরীক্ষা।

এই পরীক্ষায় ব্যবহৃত চিনির দ্রবণের ঘনত্ব বেশি, আল্‌তার জলীয় দ্রবণের ঘনত্ব কম। বিভিন্ন ঘনত্বের এই দুটি দ্রবণ ডিমের পর্দা অর্থাৎ, আভেদ্য পর্দা দিয়ে পৃথক থাকায়, আল্‌তার দ্রবণ ঐ আভেদ্য পর্দার মধ্য দিয়ে আস্রবণ প্রক্রিয়ায় চিনির দ্রবণে প্রবেশ করেছে।

ব্যাপন এবং আস্রবণ এই দুরকম প্রক্রিয়াতেই দুটি বিভিন্ন ঘনত্বের দ্রবণের ঘনত্ব সমান হয়। কিন্তু, ব্যাপনের সময় বেশি ঘনত্বের দ্রবণ

কম ঘনত্বের দ্রবণের দিকে যায়। আস্রবণের সময় কম ঘনত্বের দ্রবণ একটি আভেদ্য পর্দার মধ্য দিয়ে বেশি ঘনত্বের দ্রবণের দিকে যায়। ব্যাপনের সময় আভেদ্য পর্দার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু, আস্রবণে আভেদ্য পর্দা একান্ত প্রয়োজনীয়।

শোষণ ঃ খাদ্য প্রস্তুত করার জন্য উদ্ভিদকে পরিবেশ থেকে প্রয়োজনীয় রসদ সংগ্রহ করতে হয়। জল, নানারকম খনিজ লবণের দ্রবণ এবং কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস— এইগুলি উদ্ভিদের খাদ্যের প্রয়োজনীয় রসদ। আবার, শ্বসনের জন্য উদ্ভিদকে পরিবেশ থেকে অক্সিজেন গ্যাস গ্রহণ করতে হয়। পরিবেশ থেকে এই উপাদানগুলি উদ্ভিদ-দেহে গৃহীত হওয়ার নাম শোষণ।

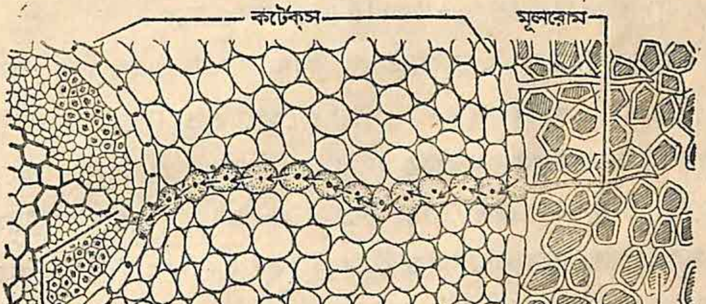
চোষ-কাগজ কালি শোষণ করে। আবার, উদ্ভিদেরাও পরিবেশ থেকে জল শোষণ করে। শোষণ যদিও ভৌত প্রক্রিয়া, তবু উদ্ভিদ-দেহে যে শোষণ হয়, সেটি পুরাপুরি প্রোটোপ্লাজ্‌ম দিয়ে নিয়ন্ত্রিত হয়। একটি সহজ পরীক্ষার সাহায্যে এই তথ্য প্রমাণ করা যায়।

সন্ধ্যাবেলায় এক মুঠা শুক্‌না ছোলা একটি বড় কাচের গ্লাসের মধ্যে রেখে, গ্লাসটি জল দিয়ে প্রায় ভর্তি করে রেখে দিলে, পরদিন সকালে দেখা যাবে যে, ছোলাগুলি ফুলে বেশ মোটা হয়েছে এবং গ্লাসটি ফোলা ছোলায় প্রায় ভর্তি হয়ে গেছে, অথচ জল উপচে পড়ে নি। শুক্‌না ছোলা আসলে অসংখ্য জীবিত কোষ দিয়ে তৈরী, তবে ঐসব কোষের প্রোটোপ্লাজ্‌মে জলের পরিমাণ খুব অল্প। জল পেয়ে, প্রোটোপ্লাজ্‌ম খুব বেশি মাত্রায় জল-শোষণ করায়, ছোলাগুলি ফুলে ওঠে। মাত্র এক মুঠা ছোলা প্রায় এক গ্লাস জল শোষণ করে। প্রয়োজন হলে, প্রোটোপ্লাজ্‌ম যে কি পরিমাণ জল শোষণ করতে পারে, এটিই তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। অথচ, শুক্‌না ছোলার পরিবর্তে যদি ভাজা (অর্থাৎ মৃত) ছোলা নেওয়া হত, তবে পরদিন সকালে দেখা যেত যে, ছোলাগুলি ফুলে বড় হয় নি, বা জলও বিশেষ কিছু কমে নি। ভাজা ছোলা যেটুকু জল শোষণ করে, সেটুকু নেহাৎ ভৌত শোষণের ফলেই সম্ভব হয়। অতএব দেখা যাচ্ছে, অন্যান্য

অবস্থা এক থাকলেও, প্রোটোপ্লাজ্‌মই শোষণ প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে। উদ্ভিদ-দেহে প্রোটোপ্লাজ্‌ম-নিয়ন্ত্রিত শোষণ-ই হয়।

উদ্ভিদেরা খনিজ লবণের দ্রবণ এবং কার্বন ডাই-অক্সাইড ও অক্সিজেন গ্যাস শোষণ করে ব্যাপন প্রক্রিয়ায়। কিন্তু, এরা জল শোষণ করে আস্রবণ প্রক্রিয়ায়। নিচে উদ্ভিদ-দেহে জল, খনিজ লবণের দ্রবণ এবং গ্যাসীয় পদার্থের শোষণ কিভাবে হয়, সে বিষয়ে আলোচনা করা হল।

**জল শোষণ ঃ** মাটির কণার চারপাশে জল পাতলা পর্দার মতো ঘিরে থাকে। ঐ জলে নানারকম খনিজ লবণও দ্রবীভূত থাকে। মূলের মূলরোম এই খনিজ লবণের জলীয় দ্রবণ থেকে কোষের মধ্যে জল টেনে নেয়। আগে বলা হয়েছে যে, জল-শোষণ আস্রবণ




50 নং চিত্র— মূলরোম দ্বারা জল-শোষণ (মূলের প্রস্থচ্ছেদের অংশ)।

প্রক্রিয়ায় হয়। আস্রবণের জন্য আভেদ্য পর্দার প্রয়োজন। মূলরোম এবং অন্যান্য সমস্ত জীবিত জীব-কোষের প্লাজ্‌মা মেমব্রেন এই আভেদ্য পর্দার কাজ করে।

মাটিতে যে খনিজ লবণের দ্রবণ থাকে, তার ঘনত্ব মূলরোমের কোষরসের ঘনত্বের চেয়ে কম। অর্থাৎ, মূলরোমের কোষরস এবং খনিজ লবণের দ্রবণ— এই দুটি বিভিন্ন ঘনত্বের দ্রবণ মূলরোমের প্লাজ্‌মা মেমব্রেন নামের আভেদ্য পর্দা দিয়ে পরস্পর পৃথক আছে।

অতএব, লবণের জলীয় দ্রবণ থেকে জল* আস্রবণ প্রক্রিয়ায় মূলরোমে প্রবেশ করে।

জল-শোষণের ফলে মূলরোমের কোষরসের ঘনত্ব কমে যায়, এবং আয়তন বেড়ে যায়। এর ফলে, মূলরোম ফুলে ওঠে। মূলরোমের ঠিক পাশে থাকে কর্টেক্স-এর বাইরের স্তরের কোষ। জল-শোষণের ফলে মূলরোমের কোষরসের ঘনত্ব কর্টেক্স-এর কোষের কোষরসের ঘনত্বের চেয়ে কম হয়ে যায়। সেইজন্য, জল মূলরোম থেকে আস্রবণ প্রক্রিয়ায় কর্টেক্স-এর কোষে প্রবেশ করে। এর ফলে, মূলরোমের কোষরসের ঘনত্ব আবার বেড়ে যায়। এই সময় মূলরোমের মধ্যে **শোষণ-চাপ** নামের একরকম চাপ সৃষ্টি হয়। মূলরোমের কোষরসের ঘনত্ব বেড়ে যাওয়ায়, এবং মূলরোমের মধ্যে শোষণ-চাপ সৃষ্টি হওয়ায়, মূলরোমের জল শোষণ করার ক্ষমতা আবার ফিরে আসে। তখন মূলরোম আবার আস্রবণ প্রক্রিয়ায় জল-শোষণ করে।

কর্টেক্স-এর বাইরের স্তরের যে কোষ মূলরোম থেকে জল শোষণ করে, তার কোষরসের ঘনত্ব (পাশের কোষের তুলনায়) কমে যায়। সুতরাং, ভিতরের স্তরের কোষ যথারীতি আস্রবণ প্রক্রিয়ায় বাইরের স্তরের কোষ থেকে জল-শোষণ করে। এইভাবে ক্রমান্বয়ে কর্টেক্স-এর বাইরের স্তরের কোষগুলি থেকে ভিতরের দিকের কোষগুলিতে জল-শোষণ চলতে থাকে। এইরকম, এক কোষ থেকে অন্য কোষে জল শোষিত হওয়াকে **কোষান্তর আস্রবণ** বলে। কোষান্তর আস্রবণ প্রক্রিয়ায় জল ক্রমে এণ্ডোডারমিস-এর কোষে পৌঁছায়।

**লবণ-শোষণ :** আগে বলা হয়েছে যে, মাটির কণার চারদিকে যে জল থাকে, তাতে নানা ধরনের খনিজ লবণ দ্রবীভূত থাকে, এবং উদ্ভিদেরা ব্যাপন প্রক্রিয়ায় লবণ শোষণ করে। মূলরোম দিয়েই লবণ শোষিত হয়। লবণ শোষিত হয় এক বিশেষ ধরনের ব্যাপন প্রক্রিয়ায়। এই বিশেষ ধরনের ব্যাপন প্রক্রিয়ার নাম **আয়ন(Ion)-**

* লবণের জলীয় দ্রবণের ঘনত্বের চেয়ে জলের ঘনত্ব কোষরসের তুলনায় আরও কম। এইজন্য, জল-ই আস্রবণ প্রক্রিয়ায় মূলরোমে প্রবেশ করে।

**বিনিময়**। আগে আরও বলা হয়েছে, ব্যাপনের সময় বেশি ঘনত্বের দ্রবণ কম ঘনত্বের দ্রবণের দিকে যায়। অথচ মূলরোমের কোষরসের ঘনত্ব মাটির লবণ-দ্রবণের ঘনত্বের চেয়ে বেশি। কাজেই মনে হতে পারে, এক্ষেত্রে কি উল্টাদিকে ব্যাপন হয়? আসলে, অবশ্য, তা হয় না। কারণ, মূলরোমের কোষরসের ঘনত্ব বেশি হলেও, কোষরসের লবণের পরিমাণ খুব বেশি থাকে না— লবণ শোষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উদ্ভিদের বিভিন্ন অঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে, কিংবা বিপাকে ব্যবহৃত হয়। অতএব, লবণের দ্রবণের ঘনত্ব মাটির তুলনায় কোষরসে কম-ই। সুতরাং, যথারীতি ব্যাপন হয়। তবে মনে রাখতে হবে যে, আয়ন-বিনিময় নামের বিশেষ ব্যাপন পুরাপুরি প্রোটোপ্লাজ্‌ম দিয়ে নিয়ন্ত্রিত হয়। অর্থাৎ, কখন কোন লবণ শোষণ করা দরকার এবং ঐ লবণ কি পরিমাণ শোষণ করা দরকার ইত্যাদি প্রোটোপ্লাজ্‌ম-ই ঠিক করে দেয়।

লবণের দ্রবণ-ও, জলের মতো, মূলরোমে প্রবেশ করার পর ক্রমে এণ্ডোডার্মিস-এ পৌঁছায়।

***গ্যাস-শোষণ*** **:** আগে বলা হয়েছে যে, উদ্ভিদেরা শ্বসনের সময় অক্সিজেন গ্যাস এবং সালোকসংশ্লেষের সময় কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস শোষণ করে। পত্রে এবং কোমল সবুজ কাণ্ডে যে অসংখ্য পত্ররন্ধ্র থাকে, তাদের মধ্য দিয়েই এই গ্যাস দুটি শোষিত হয়। গ্যাস যে ব্যাপন প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদ-দেহে শোষিত হয়, সেকথা-ও আগে বলা হয়েছে। পত্ররন্ধ্রর ঠিক ভিতরে যে বাতাবকাস থাকে, তার মধ্যেও বায়ু থাকে। কিন্তু, ঐ বায়ুতে বায়ুমণ্ডলের বায়ুর তুলনায় কার্বন ডাই-অক্সাইড ও অক্সিজেনের পরিমাণ কম থাকায়, বায়ুমণ্ডল থেকে এই দুটি গ্যাস পত্ররন্ধ্রের মধ্য দিয়ে বাতাবকাসে প্রবেশ করে। বাতাবকাসের গায়ে যে মেসোফিল কোষ থাকে, তাদের মধ্যে এই দুটি দ্রবীভূত গ্যাসের ঘনত্ব বাতাবকাসের তুলনায় কম বলে, বাতাবকাস থেকে অক্সিজেন ও কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস ব্যাপন প্রক্রিয়ায় মেসোফিল কোষে প্রবেশ করে। মেসোফিল কলায় প্রচুর

পরিমাণে আন্তঃকোষীয় রন্ধ্র থাকে। এই রন্ধ্রগুলির সঙ্গে বাতাবকাসের যোগাযোগ আছে। কাজেই, বাতাবকাস থেকে গ্যাস মেসোফিল কলার বিভিন্ন কোষে পৌঁছাতে পারে। বলা বাহুল্য, ব্যাপনের ফলে উদ্ভিদ-দেহে কার্বন ডাই-অক্সাইড ও অক্সিজেন গ্যাস প্রবেশ করতে পারে বলে, উদ্ভিদের পক্ষে যথাক্রমে সালোকসংশ্লেষ ও শ্বসন করা সম্ভব হয়।

শোষণ-প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে, যে সমস্ত উদ্ভিদের মূল মাটিতে গাঁথা থাকে এবং অন্যান্য অংশ বায়ুতে থাকে, তাদের ক্ষেত্রে মূলের মূলরোম দিয়ে জল ও খনিজ লবণ শোষিত হয়, এবং পত্র ও কচি সবুজ কাণ্ডের পত্ররন্ধ্রের মধ্য দিয়ে গ্যাস শোষিত হয়। পুরাপুরি জলে ডোবা উদ্ভিদের ক্ষেত্রে দেহের প্রায় সমগ্র তল দিয়ে জল, লবণ এবং জলে দ্রবীভূত গ্যাস শোষিত হয়।

**পরিবহণ :** কোষান্তর আস্রবণ প্রক্রিয়ায় জল এবং লবণের জলীয় দ্রবণ মূলরোম থেকে জাইলেম বাহিকার ঠিক বাইরের কোষ পর্যন্ত পৌঁছানোর পর আর কোষান্তর আস্রবণ হওয়া সম্ভব নয়। কারণ, জাইলেম বাহিকা মৃত কোষ (অর্থাৎ, প্রোটোপ্লাজ্‌ম-বিহীন)। অন্য এক উপায়ে লবণের জলীয় দ্রবণ জাইলেম বাহিকায় প্রবেশ করে। জাইলেম বাহিকার ঠিক বাইরের দিকের কোষে একরকম চাপ সৃষ্টি হয়। এর নাম **মূল-চাপ**। মূল-চাপই লবণের জলীয় দ্রবণকে জাইলেম বাহিকার বাইরের দিকের কোষ থেকে জাইলেম বাহিকার মধ্যে জোর করে ঠেলে দেয়।

জল ও লবণের দ্রবণ জাইলেম বাহিকায় প্রবেশ করার পর, কাণ্ডের মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে উপরে উঠতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত পত্রের কোষে পৌঁছায়। মূল থেকে কাণ্ডের মধ্য দিয়ে পত্রে জল ও লবণের দ্রবণের চলনকে **পরিবহণ** বলা হয়।

পরিবহণ খুব জটিল প্রক্রিয়া। ঠিক কিভাবে মৃত জাইলেম বাহিকার মধ্য দিয়ে জলীয় দ্রবণ উপরে ওঠে, সেবিষয়ে মতভেদ আছে। তবে, কয়েকটি ভৌত প্রক্রিয়া যে এই প্রসঙ্গে কাজ করে,

সেবিষয়ে সকলে একমত। যাই হোক, বর্তমান মত অনুসারে, বাহিকার মধ্যে জলীয় দ্রবণের অণুগুলি সংসক্তি* নামের এক ভৌত প্রক্রিয়ায় একে অপরকে দৃঢ়ভাবে ধরে রাখে। আবার আসঞ্জন* নামের অন্য এক ভৌত প্রক্রিয়ায় জলীয় দ্রবণের অণুগুলি বাহিকার প্রাকারের ভিতরের তলে আট্‌কে থাকে। এই দুটি ভৌত প্রক্রিয়া একসঙ্গে কাজ করায়, বাহিকার মধ্যে জলীয় দ্রবণের একটি অবিচ্ছেদ্য স্তম্ভ সৃষ্টি হয়, তার জন্য জলীয় দ্রবণের গোটা স্তম্ভটি ধীরে ধীরে উপরে উঠতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত পত্রে পৌঁছায়। কাণ্ডের মধ্য দিয়ে জল ও লবণ-দ্রবণের উর্ধ্বগতির আর এক নাম **রসের উৎস্রোত**।

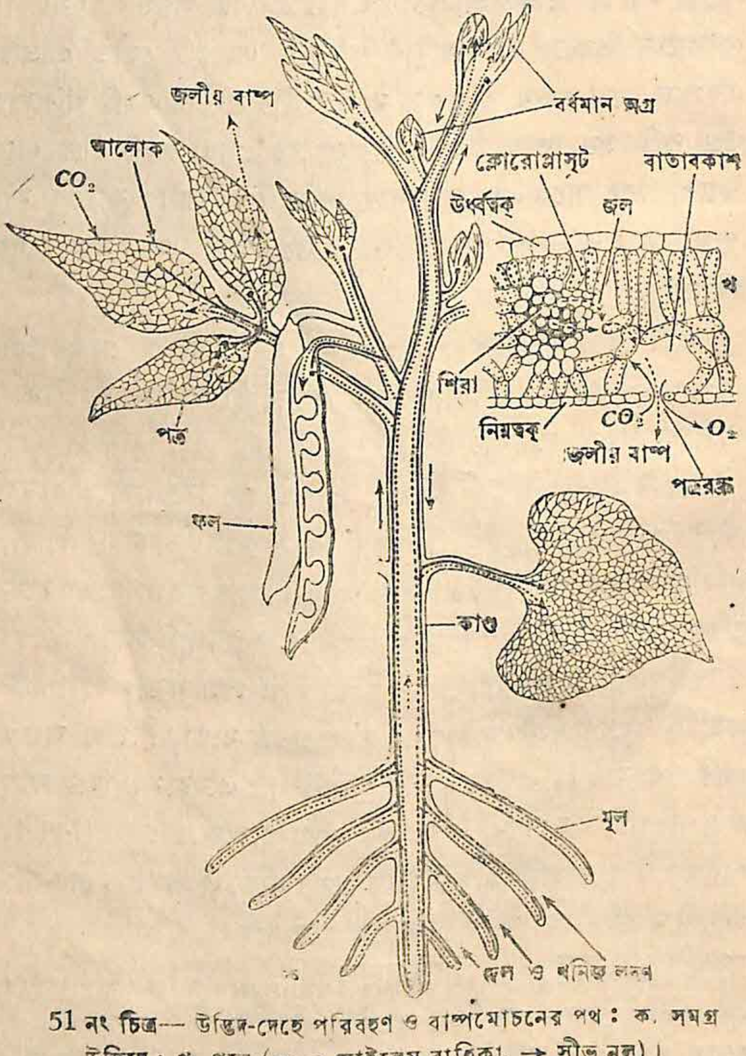
মাটি থেকে শোষিত জল ও খনিজ লবণের দ্রবণ যে কাণ্ডের জাইলেম বাহিকার মধ্য দিয়ে পত্রে পৌঁছায়, তা একটি সহজ পরীক্ষার সাহায্যে প্রমাণ করা যায়।

একটি বীকারে কিছু পরিমাণ পাতিত জল নিয়ে, তাতে কয়েক ফোঁটা আল্‌তা দিতে হয়। এরপর একটি দোপাটির চারা উপড়ে, তার মূল-অংশ জলে ভালো করে ধুয়ে, বীকারের লাল জলের মধ্যে ডুবিয়ে রেখে দিতে হয়। চার-পাঁচ ঘণ্টা পরে দোপাটি-চারার কাণ্ডের ভিতরে কয়েকটি লাল্‌চে সুতার মতো দাগ দেখা যায়। দোপাটি-চারাটির কাণ্ডের দীর্ঘচ্ছেদ করলে, লাল সুতার মতো দাগগুলি আরও স্পষ্ট দেখা যায়। এগুলি জাইলেম বাহিকা। এদের মধ্য দিয়ে লাল জল পরিবাহিত হওয়ায়, এদের রঙ লাল হয়েছে। দোপাটি-চারার পরিবর্তে তাজা রজনীগন্ধার ডাঁটি ডুবিয়ে রাখলে, একইভাবে, চার-পাঁচ ঘণ্টা পরে রজনীগন্ধা ফুলগুলি লাল্‌চে হয়ে যায়।

---

* যে বলের সাহায্যে কোনও পদার্থের কণাগুলি একে অপরের সঙ্গে আটকে থাকে অথবা থাকার চেষ্টা করে, তাকে সংসক্তি বলা হয়। সংসক্তির ফলেই জলের কণাগুলি পরস্পর লেগে থাকে। যে বলের সাহায্যে কোনও একটি পদার্থের কণা অন্য কোনও পদার্থের কণার সঙ্গে আটকে থাকে বা থাকার চেষ্টা করে, তাকে আসঞ্জন বলে। জলের কণা এবং কাচের কণার আসঞ্জনের ফলেই গ্লাসের গায়ে জল লেগে থাকে।

বলা বাহুল্য, পরিবহণের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। কারণ, জল এবং খনিজ লবণ— খাদ্যের এই দুটি গুরুত্বপূর্ণ রসদ পত্রে পৌঁছালে, সেখানে সালোকসংশ্লেষ পদ্ধতিতে খাদ্য-প্রস্তুত সম্ভব হয়।




51 নং চিত্র— উদ্ভিদ-দেহে পরিবহণ ও বাষ্পমোচনের পথ : ক. সমগ্র উদ্ভিদে ; খ. পত্রে (·····→ জাইলেম বাহিকা, → সীভ নল)।

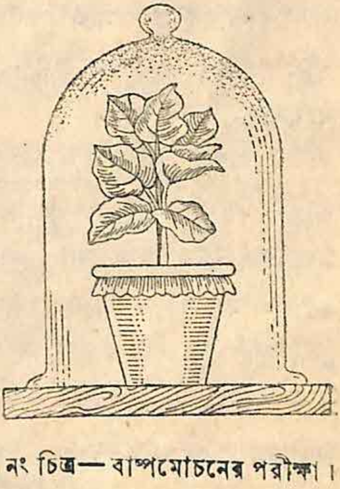
পত্রে খাদ্য-প্রস্তুতের জন্য জল ও খনিজ লবণের দ্রবণ ছাড়া কার্বন ডাই-অক্সাইড এবং অক্সিজেন গ্যাসের প্রয়োজন হয়। এই দুটি গ্যাস কিভাবে পত্রের কোষে পৌঁছায়, সেবিষয়ে আগে বলা হয়েছে।

এই সমস্ত রসদের সাহায্যে পত্রে খাদ্য প্রস্তুত হলে, উৎপন্ন খাদ্য উদ্ভিদের বিভিন্ন অঙ্গে পরিবাহিত হয়। খাদ্য পরিবাহিত হয় ফ্লোয়েমের সীভ নলগুলির মধ্য দিয়ে। সীভ নলের সীভ প্লেটের মধ্য দিয়ে খাদ্যের দ্রবণ এক কোষ থেকে অন্য কোষে প্রবেশ করে, ক্রমে দেহের বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে পড়ে। এইভাবে আমৃত্যু উদ্ভিদ-দেহে খাদ্যের রসদ (অর্থাৎ, জল ও খনিজ লবণের দ্রবণ) এবং উৎপন্ন খাদ্যের পরিবহণ চলতে থাকে।

**বাষ্পমোচন ঃ** উদ্ভিদেরা মাটি থেকে যে পরিমাণ জল শোষণ করে, তার অল্প কিছু অংশ-মাত্র খাদ্য-প্রস্তুতের জন্য এবং অন্যান্য বিপাকের প্রয়োজনে লাগে। শোষিত জলের বেশির ভাগ অংশ, অবশ্য, দিনের বেলায় উদ্ভিদের দেহ থেকে জলীয় বাষ্প আকারে বেরিয়ে যায়। **বাষ্পাকারে উদ্ভিদ-দেহ থেকে প্রয়োজনের অতিরিক্ত জল বেরিয়ে যাওয়ার নাম বাষ্পমোচন।** উদ্ভিদ যে বাষ্পমোচন করে, তা একটি পরীক্ষার সাহায্যে প্রমাণ করা যায়।

***বাষ্পমোচনের পরীক্ষা ঃ*** এই পরীক্ষার জন্য লাগবে ছোট টবে-জন্মানো একটি সতেজ চারা-গাছ, কাচের বেলজার (Bell-jar) এবং এক টুক্‌রা পলিথিন (Polythene)-এর চাদর।

চারা-গাছসহ টবের মাটির উপরের তল পলিথিনের চাদর দিয়ে ভালো করে ঢেকে দেওয়া হল। এরপর, গাছসহ টবটিকে বেলজার দিয়ে ঢেকে, রৌদ্রে রেখে দেওয়া হল।



52 নং চিত্র— বাষ্পমোচনের পরীক্ষা।

বেশ কিছু সময় পরে দেখা গেল যে, বেলজারের ভিতরের তলে ফোঁটা ফোঁটা জলকণা জমেছে।

উপরের পরীক্ষার ফলাফল থেকে বোঝা যায় যে, টবের গাছটি

মাটি থেকে যে পরিমাণ জল শোষণ করেছে, তার অন্তত কিছু অংশ গাছ থেকে বাষ্পাকারে বেরিয়ে এসে বেলজারের ভিতরের তলে জলকণা হিসাবে জমা হয়েছে। টবের ভিজা মাটি থেকে জলীয় বাষ্প উঠে বেলজারের গায়ে জমা হয় নি ; কারণ, টবের মাটি পলিথিনের চাদর দিয়ে ঢাকা ছিল। এই পরীক্ষার আগে এবংশেষে চারা-গাছ-সহ পলিথিন চাদরে মোড়া টবটি ওজন করলে দেখা যায় যে, আগের থেকেও জনের পরের ওজন কম। এ থেকে এই তথ্যও প্রমাণিত হয় যে, বাষ্পমোচনের ফলে উদ্ভিদ-দেহের ওজন কমে যায়। টবে-জন্মানো চারা-গাছের পরিবর্তে শাঙ্কব কুপীতে জল রেখে, তার মধ্যে একটি সতেজ পল্লব প্রবেশ করিয়ে, এই পরীক্ষাটি করা যায়। জলের উপরের তল থেকে বাষ্পীভবন বন্ধ করার জন্য, জলে কয়েক ফোঁটা তেল দিয়ে দিতে হয়।

সূর্যের আলোয়, পত্রের কোষের উদ্‌বৃত্ত জল কোষ-প্রাকারের মধ্য দিয়ে ব্যাপন প্রক্রিয়ায় বাষ্পাকারে বেরিয়ে এসে, আন্তঃকোষীয় রন্ধ্রে জমা হতে থাকে। আন্তঃকোষীয় রন্ধ্রগুলি একে অপরের সঙ্গে, এবং বাতাবকাসের সঙ্গে যুক্ত থাকায়, সমস্ত জলীয় বাষ্প শেষ পর্যন্ত বাতাবকাসে এসে জমা হয়, এবং সেখান থেকে পত্ররন্ধ্রের মধ্য দিয়ে বায়ুমণ্ডলে চলে আসে।

***বাষ্পমোচনের প্রয়োজনীয়তা :*** বাষ্পমোচনের ফলে যে উদ্ভিদ-দেহ থেকে কেবল প্রয়োজনের অতিরিক্ত জল বেরিয়ে যায় তাই নয়, এর ফলে কোষরসের ঘনত্ব বেড়ে যাওয়ায়, উদ্ভিদ বেশি পরিমাণে জল-শোষণ করতে পারে। বাষ্পমোচনের ফলে পত্রে যে শোষণ-চাপ সৃষ্টি হয়, তার জন্য রসের উৎস্রোত সম্ভব হয়। বাষ্পমোচনের ফলে উদ্ভিদ-দেহ ঠাণ্ডা থাকে। অবশ্য, খুব বেশি মাত্রায় বাষ্পমোচন উদ্ভিদের পক্ষে ক্ষতিকর।

বাষ্পীভবন এবং বাষ্পমোচন— এই দুটি প্রক্রিয়ায় জল বাষ্পে পরিণত হয়। কিন্তু, বাষ্পীভবন নিতান্ত ভৌত প্রক্রিয়া। বায়ুর বেগ, উষ্ণতা আর্দ্রতা ইত্যাদি ভৌত শর্তের উপর বাষ্পীভবন

নির্ভরশীল। বাষ্পমোচন যদিও এই সমস্ত শর্তের উপর নির্ভর করে, তবু এই প্রক্রিয়া প্রধানতঃ প্রোটোপ্লাজ্‌ম দিয়ে নিয়ন্ত্রিত হয়। যেমন, উষ্ণ এবং শুষ্ক বায়ুতে বেশি পরিমাণে বাষ্পমোচন হয়। কারণ, আলোর এই তীব্রতায় পত্ররন্ধ্রের ছিদ্র বেশি পরিমাণে খুলে যায়। ফলে, বেশি পরিমাণে বাষ্পমোচন হতে পারে।

## অনুশীলনী

1. ব্যাপন বলতে কি বোঝায়? একটি সহজ উদাহরণ দিয়ে, এই প্রক্রিয়াটি বুঝিয়ে বল।

2. উদ্ভিদ-দেহে কোথায় এবং কি প্রয়োজনে ব্যাপন হয়, তা লেখ।

3. আস্রবণ বলতে কি বোঝায়? এই প্রসঙ্গে একটি সহজ পরীক্ষা বর্ণনা কর।

4. আস্রবণ প্রক্রিয়াটি উদ্ভিদ কিভাবে কাজে লাগায়, সেবিষয়ে সংক্ষেপে লেখ।

5. উদ্ভিদ-দেহে জল-শোষণ কিভাবে হয়, তা একটি ছবি এঁকে বুঝিয়ে দাও।

6. উদ্ভিদ-দেহে পরিবহণ কোন পথে এবং কিভাবে হয়, সে বিষয়ে যা জান, সংক্ষেপে লেখ।

7. বাষ্পমোচন বলতে কি বোঝায়? কিভাবে বাষ্পমোচন হয়? বাষ্পমোচনের প্রয়োজনীয়তা কি?

8. উদ্ভিদ-দেহে বাষ্পমোচন প্রমাণ করার জন্য, একটি সহজ পরীক্ষা বর্ণনা কর।

9. নিচের বক্তব্যগুলির মধ্যে যেটি ঠিক, তার পাশে 'হ্যাঁ', এবং যেটি ভুল, তার পাশে 'না' লেখ :—

(ক) ব্যাপনের সময় বেশি ঘনত্বের তরল পদার্থ কম ঘনত্বের তরল পদার্থের দিকে যায়; (খ) আস্রবণ প্রক্রিয়ায় আভেদ্য পর্দার সাহায্যের প্রয়োজন হয়; (গ) উদ্ভিদেরা আস্রবণ প্রক্রিয়ায় লবণ শোষণ করে; (ঘ) বাষ্পমোচন রসের উৎস্রোতে সাহায্য করে; (ঙ) বাষ্পমোচনের ফলে উদ্ভিদের ওজন কমে যায়।

10. শূন্যস্থান পূরণ কর :—

(ক) ধূপের ধোঁয়া সারা ঘরে ছড়িয়ে পড়া — প্রক্রিয়ার উদাহরণ; (খ) মূলরোম দিয়ে, আস্রবণ প্রক্রিয়ায় জল-শোষণের সময় — — আভেদ্য পর্দার কাজ করে; (গ) জল ও লবণের দ্রবণ কাণ্ডের — মধ্য দিয়ে উপরের দিকে ওঠে; (ঘ) খাদ্যের দ্রবণ — —এর মধ্য দিয়ে পরিবাহিত হয়; (ঙ) বাষ্পমোচনের সময় উদ্ভিদ-দেহ থেকে জলীয় বাষ্প বেরিয়ে আসে —এর মধ্য দিয়ে।

ছেদটির প্রতিবিম্ব আরও বড় করে দেখতে হলে, এরপর নোজ-পীস (Nose-piece)-টিকে ঘুরিয়ে, উচ্চশক্তি-সম্পন্ন অভিলক্ষ্যটিকে ছেদের ঠিক উপরে রাখতে হয়। এখন, সূক্ষ্ম সন্নিবেশক স্ক্রু ঘুরিয়ে ছেদের প্রতিবিম্ব স্পষ্ট করতে হয়। অণুবীক্ষণ যন্ত্র ব্যবহারের সময় যথেষ্ট সাবধান হওয়া উচিত, এবং ঠিক নিয়মমতো ব্যবহার করা উচিত।

অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে প্রস্থচ্ছেদ পর্যবেক্ষণ করা শেষ হলে, প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রস্থচ্ছেদের যথাযথ ছবি আঁকতে হয় এবং ছবিতে বিভিন্ন কলা চিহ্নিত করতে হয়।

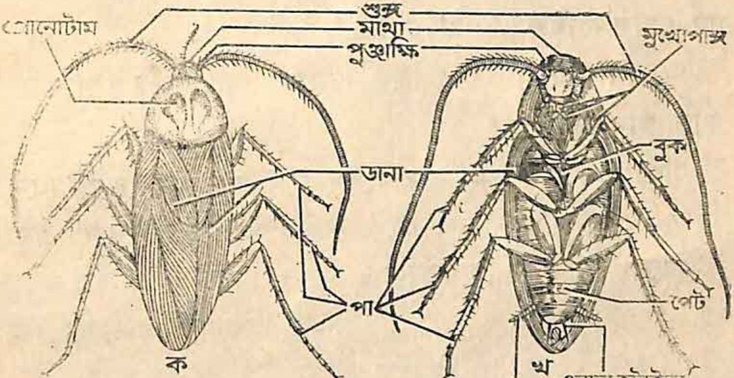
উপরে বর্ণিত উপায়ে দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদের কাণ্ডের (সূর্যমুখীর কাণ্ডের) ও একবীজপত্রী উদ্ভিদের কাণ্ডের (ভুট্টার কাণ্ডের), এবং দ্বিবীজপত্রী মূলের (ছোলার মূলের) ও একবীজপত্রী মূলের (কচুর মূলের) প্রস্থচ্ছেদ অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে পর্যবেক্ষণ করলে, দ্বিবীজপত্রী ও একবীজপত্রী কাণ্ডের, এবং দ্বিবীজপত্রী ও একবীজপত্রী মূলের গঠনগত পার্থক্য খুব সহজেই ধরা যায়। যেমন, সূর্যমুখী কাণ্ডের নালিকা বাণ্ডিলগুলি মোটামুটি একই রকমের এবং এরা একটি বৃত্তের পরিধি-বরাবর বিন্যস্ত থাকে। ভুট্টা কাণ্ডের নালিকা বাণ্ডিলগুলি আদিকলায় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত থাকে, এবং পরিধির দিকের নালিকা বাণ্ডিলগুলি ছোট, কেন্দ্রের দিকেরগুলি বড়। তেমনিভাবে, কচুর মূলে নালিকা বাণ্ডিলের সংখ্যা আটটি, কিন্তু ছোলার মূলে নালিকা বাণ্ডিলের সংখ্যা চারটি।

**আরসোলার বহিরাকৃতি ঃ** ক্লোরোফরম (Chloroform) দিয়ে অজ্ঞান করা একটি পুরুষ- ও স্ত্রী-আরসোলা ট্রে(Tray)-তে রেখে, এদের বহিরাকৃতি পর্যবেক্ষণ করতে হয়। আরসোলা উপর-নিচে চাপা, লম্বাটে, গাঢ় বাদামী রঙের পতঙ্গ। এর দেহের তিনটি প্রধান ভাগ— **মাথা, বুক** এবং **পেট**।

আরসোলার মাথা তিন-কোণা এবং গ্রীবা নামের একটি ছোট অংশের সাহায্যে বুকের সঙ্গে উল্লম্বভাবে যুক্ত। মাথার সামনের অংশ

নিচের দিকে থাকে। মাথার উপরের দিকে ছুটি বড় বড় **পুঞ্জাক্ষি** এবং গাঁট-যুক্ত ছুটি লম্বা **শুঙ্গ** থাকে। মাথার সামনের দিকে ছুটি **ম্যাণ্ডিব্‌ল** (Mandible), এবং ম্যাণ্ডিব্‌ল-এর পিছনে একজোড়া **লেব্রাম** (Labrum) থাকে। লেব্রামের পিছনে থাকে একজোড়া **লেবিয়াম** (Labium)। লেবিয়ামের ভিতরের দিকে **হাইপোফ্যারিংস** (Hypopharynx) নামের একটি পাতলা অংশ থাকে। লেব্রামের নিচে **মুখ** থাকে। মুখের চারপাশে থাকে বলে, ম্যাণ্ডিব্‌ল, লেব্রাম, লেবিয়াম এবং হাইপোফ্যারিংসকে **মুখোপাঙ্গ** বলা হয়।

আরসোলার বুকের তিনটি ভাগ— সামনের দিকে **অগ্রবক্ষ,** মাঝে **মধ্যবক্ষ** এবং পিছনে **পশ্চাৎ-বক্ষ**। অগ্রবক্ষের উপরের তলে একটি




56 নং চিত্র— আরসোলার বহিরাকৃতি : ক. পৃষ্ঠদৃশ্য ; খ. অঙ্কদৃশ্য।

বড়, তিন-কোণা, শক্ত আবরণ থাকে। এটি গ্রীবাকে এবং মধ্যবক্ষের প্রথম অংশকে ঢেকে রাখে। এর নাম **প্রোনোটাম** (Pronotum)। অগ্রবক্ষ ও মধ্যবক্ষের সংযোগ-স্থলের উপরের দিকে একজোড়া, এবং মধ্যবক্ষ ও পশ্চাৎ-বক্ষের সংযোগ-স্থলের ঐরকম জায়গায় আর এক জোড়া ডানা আট্‌কানো থাকে। প্রথম ডানা জোড়া পুরু, দ্বিতীয় জোড়া পাতলা। প্রথম জোড়া ডানা দ্বিতীয় জোড়াটিকে ঢেকে রাখে।

বুকের প্রতিটি ভাগের নিচের দিকের দুপাশে দুটি করে, মোট তিন জোড়া গাঁট-যুক্ত পা আট্‌কানো থাকে।

আরসোলার পেট দশটি দেহ-খণ্ডক দিয়ে তৈরী। তবে, বাইরে থেকে পুরুষ-আরসোলার ন'টি এবং স্ত্রী-আরসোলার সাতটি দেহ-খণ্ডক মাত্র দেখা যায়। পুরুষ-আরসোলার পেট লম্বাটে এবং মোটামুটি সুচালো। পুরুষ-আরসোলার পেটের নবম খণ্ডকের অঙ্কদেশে **জনন-ছিদ্র** থাকে। স্ত্রী-আরসোলার পেট মোটা এবং শেষের দিক ভোঁতা, সপ্তম খণ্ডকটি কিছুটা বড় এবং এই খণ্ডকের অঙ্কদেশে জনন-ছিদ্র থাকে। আরসোলার শেষ দেহ-খণ্ডকে গাঁট-যুক্ত একজোড়া **পায়ুকূর্চ** বা **এনাল সার্‌কাস** (Anal cercus) নামের ছোট দণ্ড থাকে। পায়ুকূর্চের কাছেই থাকে **পায়ু**। কেবল পুরুষ-আরসোলার পেটের নবম খণ্ডকের দুপাশে আরও দুটি গাঁট-বিহীন কূর্চ থাকে। এদের নাম **এনাল স্টাইল** (Anal style)।

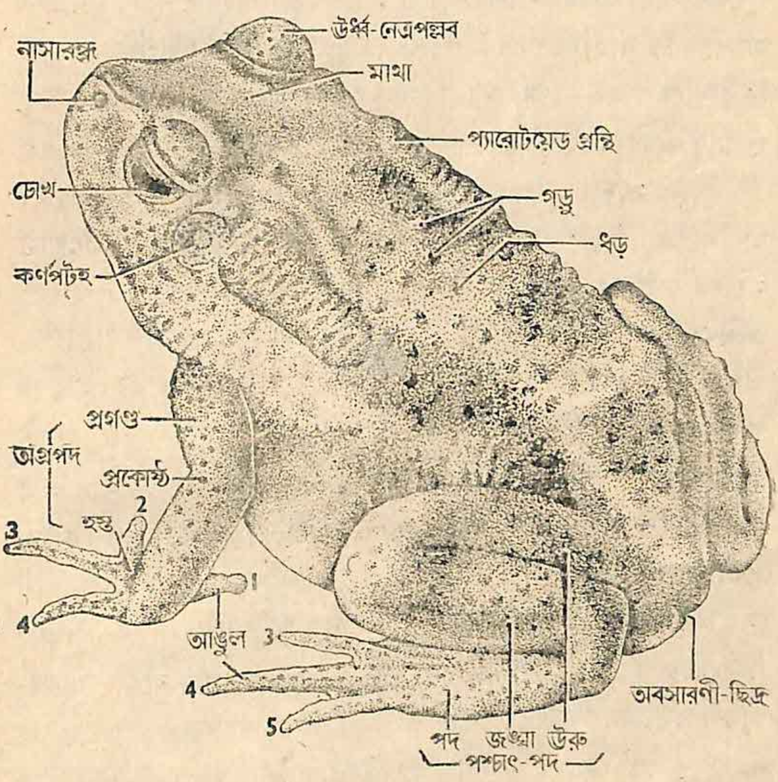
আরসোলার বুকের দুপাশে দুজোড়া এবং পেটের দুপাশে আট জোড়া **শ্বাসছিদ্র** নামের ছিদ্র থাকে।

বহিরাকৃতি পর্যবেক্ষণ করা শেষ হলে, আরসোলার দুটি (একটি অঙ্কদৃশ্য, একটি পৃষ্ঠদৃশ্য) ছবি এঁকে, বিভিন্ন অংশ চিহ্নিত করতে হয়।

**কুনো ব্যাঙের বহিরাকৃতি ঃ** ক্লোরোফর্মের সাহায্যে অজ্ঞান করা একটি কুনো ব্যাঙ ট্রে'তে নিয়ে, এর বহিরাকৃতি পর্যবেক্ষণ করতে হয়। কুনো ব্যাঙের পিঠের দিক কাল্‌চে ছাই রঙের, পেটের দিকের রঙ ঘোলাটে সাদা। এদের চামড়া খস্‌খসে ; দেহের প্রায় সব জায়গায়, বিশেষ করে পিঠের দিকে অসংখ্য ছোট-বড় **গড়ু** থাকে।

কুনো ব্যাঙের দেহ **মাথা** এবং **ধড়**—এই দুটি প্রধান ভাগে বিভক্ত। এদের মাথা মোটামুটি তিন-কোণা, তবে অনেকটা ভোঁতা। মাথার সামনের দিকে খুব বড় **মুখ** থাকে। মুখের উপরে ও নিচে যথাক্রমে **উপরের চোয়াল** ও **নিচের চোয়াল** থাকে। চোয়ালে দাঁত নেই। মুখ দিয়ে কুনো ব্যাঙ খাদ্যগ্রহণ করে, চোয়াল দুটি এতে সাহায্য করে। মাথার সামনের দিকে, কিছুটা উপরে একজোড়া

**নাসারন্ধ্র** এবং প্রত্যেকটি নাসারন্ধ্রের পিছনদিকে একটি করে বড় গোলাকার চোখ দেখা যায়। শ্বসনের সময় নাসারন্ধ্র দিয়ে দেহের ভিতরে বায়ু প্রবেশ করে এবং দেহ থেকে বাইরে বায়ু বেরিয়ে আসে। চোখ দুটি দর্শনেন্দ্রিয়। প্রতিটি চোখের উপরে ও নিচে থাকে যথাক্রমে **ঊর্ধ্ব-নেত্রপল্লব** বা **চোখের উপরের পাতা** এবং **নিম্ন-নেত্রপল্লব** বা




57 নং চিত্র— কুনো ব্যাঙের বহিরাকৃতি।

**চোখের নিচের পাতা**। চোখের ভিতরের কোণে **উপপল্লব** নামের ঈষদচ্ছ পর্দার মতো তৃতীয় একটি চোখের পাতা থাকে। চোখের পাতাগুলির সাহায্যে কুনো ব্যাঙের চোখ বন্ধ হতে পারে। প্রতিটি চোখের অল্প পিছনদিকে, মসৃণ চর্ম দিয়ে ঢাকা একটি করে গোল

## ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা | 6

নানারকম পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষা ও নিরীক্ষার মাধ্যমে জীবনের নানা ধর্ম সম্বন্ধে সঠিক তথ্য সংগ্রহ করা যায়। জীব-দেহ সম্বন্ধে ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা লাভ করার জন্য বহিরাকৃতি পর্যবেক্ষণ করা, বিভিন্ন ধরনের ছেদ করা এবং ব্যবচ্ছেদ করা দরকার হয়। এই পরিচ্ছেদে মূল, কাণ্ড ও পত্রের কি করে প্রস্থচ্ছেদ কাটতে হয়, কিভাবে আরসোলা ও কুনো ব্যাঙের বহিরাকৃতি পর্যবেক্ষণ করতে হয়, এবং কুনো ব্যাঙের আন্তরযন্ত্র কি উপায়ে ব্যবচ্ছেদ করতে হয়, সেবিষয়ে বলা হল।

**মূল, কাণ্ড ও পত্রের ছেদ কাটার পদ্ধতি ঃ** মূল, কাণ্ড ও পত্রের কলা-বিন্যাস পরীক্ষা করার জন্য এদের ছেদ কাটতে হয়। অঙ্গের কোনও তল থেকে সূক্ষ্ম করে এবং সমানভাবে কিছু অংশ কেটে বের করাকে **ছেদ কাটা** বলে, এবং এইভাবে যে সূক্ষ্ম অংশটি পাওয়া যায়, তাকে **ছেদ** বলে। অঙ্গের লম্বা অক্ষের সঙ্গে সমকোণে ছেদ কাটলে, **প্রস্থচ্ছেদ** পাওয়া যায়। মূল, কাণ্ড অথবা পত্রের ছেদ করতে হলে, ঐগুলি নরম ও রসালো হওয়া দরকার। কারণ, খুব শক্ত ও কাষ্ঠল অংশের সূক্ষ্ম ছেদ করা সম্ভব হয় না।

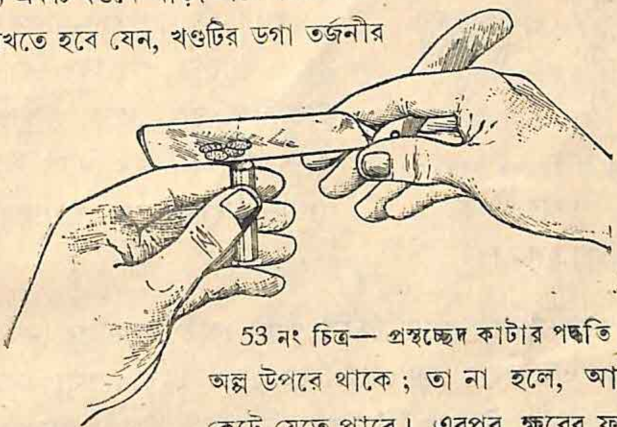
ছেদ যাতে সূক্ষ্ম (অর্থাৎ, পাতলা) এবং সমান হয়, সেদিকে বিশেষ নজর দেওয়া দরকার। ছেদ কাটার জন্য বিশেষ এক রকমের **ক্ষুর*** ব্যবহার করতে হয়। এর নাম **সমাবতল ক্ষুর**। এই ক্ষুরের ফলার নিচের তল সমতল, উপরের তল অবতল।

ছেদ কাটার জন্য ক্ষুর ধরার সঠিক নিয়ম মেনে চলতে হয়। প্রথমে ক্ষুরের হাতল ফলার সঙ্গে সমকোণে রাখতে হয়। এরপর ফলা

* ছেদ করার জন্য অনেকে ক্ষুরের বদলে দাড়ি কামানোর ব্লেড (Blade) ব্যবহার করে। ব্লেডে সূক্ষ্ম ছেদ করা গেলেও, ছেদগুলি সাধারণতঃ সমান হয় না। তা ছাড়া, ব্লেড সুবিধাজনকভাবে ধরা যায় না। তবে, ব্লেড ধরার হাতলের মধ্যে ব্লেড আটকে, ঐ ব্লেডের সাহায্যে পাতলা ও সমান ছেদ কাটা যায়।

ও হাতলের সংযোগ-স্থলে ডানহাতের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ, তর্জনী ও মধ্যমার ডগা দিয়ে ক্ষুরটিকে শক্ত করে অনুভূমিক তলে ধরতে হয়। এই অবস্থায়, বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ফলার সামনের দিকে এবং তর্জনী ও মধ্যমা এর বিপরীত দিকে থাকে।

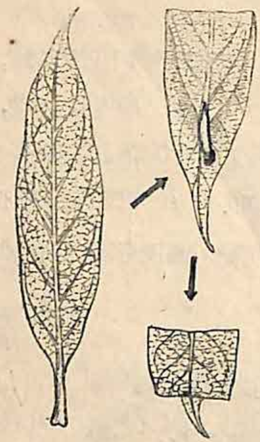
সূর্যমুখী, ভুট্টা, কুমড়া ইত্যাদির কাণ্ডের প্রস্থচ্ছেদ কাটতে হলে, এদের কচি, কোমল ও সরু কাণ্ড নিতে হয়। ধরার সুবিধার জন্য, কাণ্ডটিকে প্রথমে দু-তিন সেন্টিমিটার লম্বা কয়েকটি খণ্ডে কেটে, ওয়াচ-গ্লাস(Watch-glass)-এ জল রেখে, খণ্ডগুলিকে ঐ জলে ভিজিয়ে রাখতে হয়। প্রস্থচ্ছেদ কাটার জন্য, বাঁহাতের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ও তর্জনীর সাহায্যে একটি খণ্ডকে খাড়াভাবে ধরতে হয়। লক্ষ্য রাখতে হবে যেন, খণ্ডটির ডগা তর্জনীর



53 নং চিত্র— প্রস্থচ্ছেদ কাটার পদ্ধতি।

অল্প উপরে থাকে ; তা না হলে, আঙুল কেটে যেতে পারে। এরপর, ক্ষুরের ফলার উপরের (অর্থাৎ, অবতল) তলে কয়েক ফোঁটা জল নিয়ে, আগে বর্ণিত পদ্ধতিতে ক্ষুরটি ডানহাতে ধরে, ক্ষুরের নিচের (অর্থাৎ, অবতল) তলটি কাণ্ডের টুক্‌রার ডগার উপর রাখতে হয়। এই অবস্থায়, ক্ষুরটি টুক্‌রার উপর সামনের দিকে এবং নিজের দেহের দিকে কয়েকবার টানলে, প্রস্থচ্ছেদ বের হয়ে আসে। ক্ষুর দিয়ে বেশি চাপ দেওয়ার দরকার হয় না— অল্প ঘষলেই প্রস্থচ্ছেদগুলি ক্ষুরের ফলার উপরের তলে উঠে আসে। এরপর, একটি নরম বুরুশ জলে ভিজিয়ে, ঐ ভিজা বুরুশের সাহায্যে প্রস্থচ্ছেদগুলিকে ক্ষুরের ফলা থেকে তুলে নিয়ে, অন্য একটি ওয়াচ-গ্লাসে রাখা পাতিত জলে ভাসিয়ে দিতে হয়।

খুব সরু (অথবা পাতলা) ও নরম উদ্ভিদ-অঙ্গ, যেমন, সদ্য-অঙ্কুরিত ছোলার মূল, কচি আম-পাতা ইত্যাদি হাতে ধরে প্রস্থচ্ছেদ কাটতে অসুবিধা হয়। গাজরের মাঝামাঝি অংশ থেকে হাতে-ধরার উপযুক্ত একটি আয়তাকার টুক্‌রা কেটে নিয়ে, টুক্‌রাটির মাঝ-বরাবর আড়াআড়িভাবে চিরে, তার মধ্যে মূল অথবা পাতার টুক্‌রাটি প্রবেশ করিয়ে দিয়ে, আগের মতো উপায়ে প্রস্থচ্ছেদ কাটতে হয়। গাজরের ছেদের সঙ্গে মূল অথবা পাতার প্রস্থচ্ছেদ পাওয়া যায়।

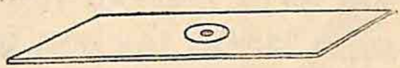

54 নং চিত্র— পাতা ভাঁজ করার পদ্ধতি।

আর এক পদ্ধতিতে গাজর ছাড়া-ই, সহজে পাতার প্রস্থচ্ছেদ করা যায়। পাতাটিকে বৃন্ত থেকে আগার দিকে কয়েকবার ভাঁজ করে নিলে, ভাঁজ করা পাতাটি বাঁহাতে ধরে, প্রস্থচ্ছেদ করতে অসুবিধা হয় না।

ওয়াচ-গ্লাসের জলে ভেসে থাকা প্রস্থচ্ছেদগুলির মধ্য থেকে পাতলা এবং সমান ছেদ বেছে নিতে হয়। ছেদ পাতলা এবং সমান হলে, জলের উপরের দিকে অনুভূমিক তলে ভাসতে থাকে। কিন্তু, ছেদ তির্যক (অর্থাৎ, অসমান) হলে, জলের মধ্যে বাঁকাভাবে ভাসতে থাকে। এই উপায়ে ভালো একটি ছেদকে বেছে নিয়ে, তুলির সাহায্যে তুলে নিয়ে, কাচের স্লাইড(Slide)-এর উপর রাখতে হয়।

কাচের স্লাইডের ঠিক মাঝখানে ড্রপার(Dropper)-এর সাহায্যে এক ফোঁটা পাতিত জল দিয়ে, ঐ জলের মধ্যে প্রস্থচ্ছেদটি রাখতে হয়। দরকার হলে, তুলির ডগা থেকে প্রস্থচ্ছেদটিকে ছাড়িয়ে নেওয়ার জন্য, হাতল-যুক্ত লম্বা সুচের সাহায্য নেওয়া যেতে পারে। এরপর একটি পরিষ্কার আবরণী কাচ বাঁহাতের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ও তর্জনীর

সাহায্যে অল্প বাঁকাভাবে ধরে, স্লাইডের উপরের জলে আবরণী কাচের প্রান্ত স্পর্শ করাতে হয়। এরপর ডানহাতে-ধরা হাতল-যুক্ত সুচের সাহায্যে আবরণী কাচটিকে প্রস্থচ্ছেদের উপর ধীরে ধীরে নামিয়ে দিতে হয়। আবরণী কাচটি ধীরে ধীরে নামালে, আবরণী কাচের নিচে বুদ্‌বুদ্‌ থাকে না। যদি বুদ্‌বুদ্‌ থেকে যায়, তবে ড্রপারের সাহায্যে আবরণী কাচের পাশে এক ফোঁটা জল দিলে, বুদ্‌বুদ্‌ বেরিয়ে আসে। এরপর এক টুকরা চোষ-কাগজের সাহায্যে আবরণী কাচের চারপাশ থেকে অতিরিক্ত জল শোষণ করে নিতে হয়। এইভাবে প্রস্থচ্ছেদটি অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে পর্যবেক্ষণ করার উপযুক্ত হয়। যে পদ্ধতিতে ছেদ কাচের স্লাইডের উপরে রেখে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে পর্যবেক্ষণের উপযোগী করা হয়, তার নাম **উপরিস্থাপন**।



55 নং চিত্র — উপরিস্থাপন-পদ্ধতি।

স্লাইডের উপরে রাখা প্রস্থচ্ছেদটি অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দেখার আগে, অণুবীক্ষণযন্ত্রের কতকগুলি অংশের সমন্বয়ন করতে হয়। প্রথমে ডায়াফ্রাম (Diaphragm) উন্মুক্ত করতে হয়। এরপর সবচেয়ে নিম্ন-শক্তিসম্পন্ন অভিলক্ষ্যটি মঞ্চের মাঝখানের ছিদ্রের উপর রাখতে হয়। শেষে অভিনেত্রের উপর চোখ রেখে, দর্পণটিকে আলোর উৎসের দিকে এমনভাবে ঘুরিয়ে নিতে হয়, যাতে অভিনেত্রের ক্ষেত্রটিকে সবচেয়ে উজ্জ্বল দেখায়।

অণুবীক্ষণ যন্ত্রের অংশগুলির সমন্বয়ন করার পর, স্থূল সন্নিবেশক স্ক্রু (Screw) ঘুরিয়ে অভিলক্ষ্যটিকে অল্প উপরে তুলে নিয়ে, ছেদ-সহ স্লাইডটিকে মঞ্চের উপর ক্লীপ (Clips) দিয়ে এমনভাবে এঁটে দিতে হয়, যাতে ছেদটি মঞ্চের মাঝখানে ছিদ্রের ঠিক উপরে থাকে। এখন, অভিনেত্রের উপর চোখ রেখে এবং স্থূল সন্নিবেশক স্ক্রু ঘুরিয়ে, যতক্ষণ পর্যন্ত ছেদের প্রতিবিম্ব না দেখা যায়, ততক্ষণ পর্যন্ত অভিলক্ষ্যটিকে মঞ্চের দিকে ধীরে ধীরে নামাতে হয়। শেষে সূক্ষ্ম সন্নিবেশক স্ক্রু ঘুরিয়ে, ছেদের প্রতিবিম্ব আরও স্পষ্টভাবে দেখা যায়।

অঞ্চল দেখা যায়। এরা কুনো ব্যাঙের **কর্ণপটহ**। শ্রবণে সাহায্য করা এদের কাজ।

ধড়ের প্রথম অংশের পিঠের দিকে, প্রতিটি কর্ণপটহের পিছনে একটি করে লম্বাটে উঁচু অঞ্চল দেখা যায়। এদের নাম **প্যারোটয়েড (Parotoid)* গ্রন্থি**। প্যারোটয়েড গ্রন্থি দুটি এবং গড়ুগুলি থেকে পুঁজের মতো একরকম চট্‌চটে রস ক্ষরিত হয়। এই রস কুনো ব্যাঙকে আত্মরক্ষায় সাহায্য করে। ধড়ের শেষপ্রান্তে **অবসারণী-ছিদ্র** নামের ছিদ্র থাকে। এই ছিদ্রের মধ্য দিয়ে মল, মূত্র এবং জনন-কোষ (অর্থাৎ, শুক্রাণু অথবা ডিম্বাণু) দেহ থেকে বের হয়ে আসে।

ধড়ের সামনের দিকের দুপাশের সঙ্গে দুটি **অগ্রপদ** যুক্ত থাকে। অগ্রপদের তিনটি করে প্রধান অংশ—দেহ-সংলগ্ন **প্রগণ্ড, প্রকোষ্ঠ** নামের মাঝের অংশ এবং **হস্ত**। প্রকোষ্ঠ ও হস্তের সংযোগ-স্থলকে **মণিবন্ধ** বা **কব্‌জি** বলে। হস্তের সঙ্গে চারটি **আঙুল** লাগানো থাকে। তৃতীয় আঙুলটি সবচেয়ে লম্বা। ধড়ের পিছনের অংশের দুপাশের সঙ্গে দুটি **পশ্চাৎ-পদ** যুক্ত থাকে। পশ্চাৎ-পদেও তিনটি করে প্রধান ভাগ— দেহ-সংলগ্ন **উরু, জঙ্ঘা** নামের মাঝের অংশ এবং **পদ** নামের শেষ অংশ। জঙ্ঘা ও পদের সংযোগ-স্থলকে **গুল্‌ফ** বা **গোড়ালি** বলে। পায়ে পাঁচটি করে **আঙুল** থাকে। চতুর্থ আঙুলটি সবচেয়ে লম্বা। পশ্চাৎ-পদের আঙুলগুলির গোড়ার দিক পাতলা চর্ম দিয়ে পরস্পর জোড়া। এইরকম পদকে **লিপ্তপাদ** বলে। পুরুষ-কুনো ব্যাঙের অগ্রপদের প্রথম ও দ্বিতীয় আঙুলের গোড়ায় দুটি করে কালো রঙের নরম গদির মতো অংশ থাকে। এদের নাম **থাম্ব প্যাড (Thumb pad)**। কেবল প্রজনকালেই থাম্ব প্যাড দেখা যায়। যৌন-সঙ্গমের সময় স্ত্রী-কুনো ব্যাঙকে আঁকড়ে ধরতে সাহায্য করা থাম্ব প্যাডের কাজ। অগ্রপদ ও পশ্চাৎ-পদ কুনো ব্যাঙের গমন-অঙ্গ ; অর্থাৎ, এরা গমনে সাহায্য করে।

বহিরাকৃতি পর্যবেক্ষণ করা শেষ হলে, কুনো ব্যাঙের দুটি

* আগে এদের প্যারোটিড (Parotid) গ্রন্থি বলা হতো।

(একটি অঙ্কদৃশ্য, একটি পৃষ্ঠদৃশ্য) ছবি আঁকতে হয় এবং প্রতিটি অংশ চিহ্নিত করতে হয়।

কোলা ব্যাঙ বা সোনা ব্যাঙ দেখতে মোটামুটি কুনো ব্যাঙের-ই মতো। তবে, কোলা ব্যাঙ কুনো ব্যাঙের থেকে অনেক বড় হতে পারে। এর পেটের দিক সোনালী-হলুদ, পিঠের দিক শেওলা-সবুজ রঙের, পিঠের দিকে কালো ডোরা এবং ছাপ দেখা যায়। কোলা ব্যাঙের মাথা তিন-কোণা ; তবে, সামনের দিক বেশি সুচালো। এদের উপরের চোয়ালে দাঁত থাকে। কোলা ব্যাঙের চর্ম মসৃণ এদের গড় থাকে না এবং বাইরে থেকে প্যারোটয়েড গ্রন্থিও দেখা যায় না। এদের কোমরে একটি কুঁজ থাকে।

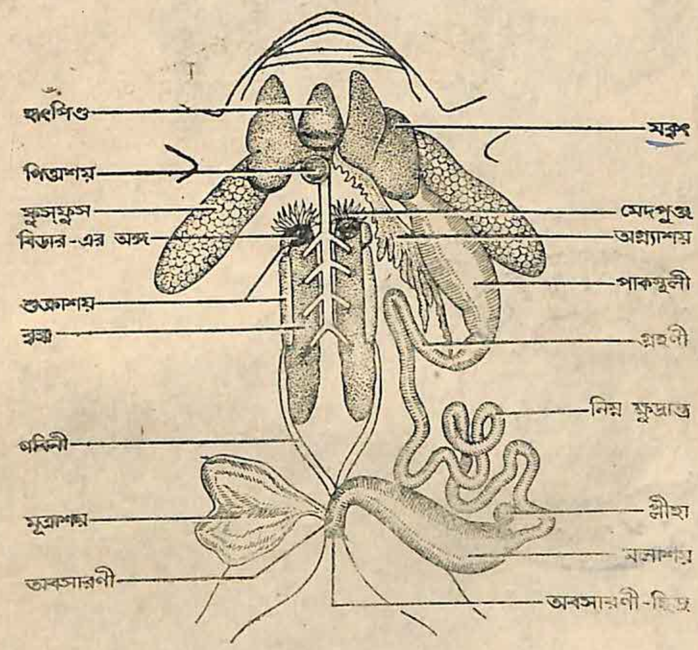
**কুনো ব্যাঙের আন্তরযন্ত্র ব্যবচ্ছেদ-প্রণালী ঃ** ক্লোরোফরম দিয়ে অজ্ঞান করা ব্যাঙকে মোম-যুক্ত ট্রে'র উপর এমনভাবে রাখা হয়, যাতে এর পেটের দিক উপরের দিকে এবং পিঠের দিক নিচের দিকে থাকে। কুনো ব্যাঙ মেরুদণ্ডী প্রাণী বলে, একে পেটের দিক থেকে ব্যবচ্ছেদ করতে হয়। মেরুদণ্ডী প্রাণীর পিঠের দিকে নার্ভ-তন্ত্র থাকে। নার্ভ-তন্ত্র ক্ষতিগ্রস্ত হলে, হৃৎ-ঘাত বন্ধ হয়ে যায় এবং সহজেই প্রাণীটি মারা যায়। ফলে, ধমনী-তন্ত্র ও শিরা-তন্ত্র ইত্যাদি ব্যবচ্ছেদ করার অসুবিধা হয়। তা ছাড়া, পিঠের দিকে মেরুদণ্ড থাকায়, মেরুদণ্ডী প্রাণীকে পিঠের দিক থেকে ব্যবচ্ছেদ করা অসুবিধা-জনক। সেইজন্য, ব্যাঙ এবং সমস্ত মেরুদণ্ডী প্রাণীকে পেটের দিক থেকে ব্যবচ্ছেদ করা হয়। কেঁচো, আরসোলা এবং অন্য সব অমেরুদণ্ডী প্রাণীর নার্ভ-তন্ত্রের প্রধান অংশ পেটের দিকে থাকে। সেইজন্য, অমেরুদণ্ডী প্রাণীদের পিঠের দিক থেকে ব্যবচ্ছেদ করার নিয়ম।

কুনো ব্যাঙটিকে উপরে বর্ণিত উপায়ে ট্রে'র উপরে রেখে, এর অগ্রপদ ও পশ্চাৎ-পদ চারটি আল্‌পিনের সাহায্যে ট্রে'র মোমের সঙ্গে টান-টান করে আট্‌কে দিতে হয়। এরপর জল দিয়ে ট্রে ভর্তি করে, বড় চিম্‌টা ও বড় কাঁচির সাহায্যে অঙ্ক-মধ্যরেখার চর্মে একটি ছোট ছিদ্র করতে হয়, এবং ঐ ছিদ্রের মধ্যে বড় কাঁচির ভোঁতা দিক প্রবেশ

করিয়ে, অঙ্ক-মধ্যরেখা-বরাবর চর্মকে লম্বালম্বি করে কেটে ফেলতে হয়। একই উপায়ে, অগ্রপদ ও পশ্চাৎ-পদের চর্ম কাটতে হয়। এরপর, চর্মের কাটা অংশগুলি পেশী থেকে ছাড়িয়ে, দেহের দুপাশে টান-টান করে, আল্‌পিন দিয়ে মোমের সঙ্গে আট্‌কে দিতে হয়। পেশী-স্তরের অঙ্ক-মধ্যরেখা-বরাবর একটি কাল্‌চে দাগ দেখা যায়। এটি অ্যান্‌টি-রিয়র অ্যাব্‌ডোমিনাল শিরার অবস্থান নির্দেশ করে। আগের মতো একটি করে ছিদ্র করে এবং ছিদ্রের ভিতর দিয়ে বড় কাঁচির ভোঁতা দিক প্রবেশ করিয়ে দিয়ে, কালো দাগটির দুপাশ-বরাবর পেশী-স্তর কেটে ফেলে, শিরাটিকে সাবধানে পেশী-স্তর থেকে ছড়িয়ে নিতে হয়। এই পেশীর টুক্‌রাটিকে কেটে বাদ দেওয়ার পর, দুপাশের পেশী-স্তরকেও চর্মের মতো টান-টান করে, ট্রে'র সঙ্গে আট্‌কে দিতে হয়। এইভাবে দেহ-গহ্বর উন্মুক্ত হওয়ার পর, দেহ-গহ্বরের মধ্যের বিভিন্ন অঙ্গ অর্থাৎ, আন্তরযন্ত্র দেখা যায়। এরপর, নিচে বর্ণিত উপায়ে আন্তরযন্ত্রের বিভিন্ন অঙ্গ পর্যবেক্ষণ করতে হয়।

দেহ-গহ্বরের সামনের দিকের মধ্যরেখা-বরাবর মোটামুটি তিন-কোণা **হৃৎপিণ্ড** দেখা যায়। প্রথমদিকে হৃৎপিণ্ডটি সঙ্কোচন-প্রসারণ করতে থাকে। একটি পাতলা পর্দা দিয়ে হৃৎপিণ্ডটি আবৃত থাকে। ছোট চিম্‌টা এবং কাঁচির সাহায্যে এই পর্দাটি কেটে বাদ দিতে হয়। হৃৎপিণ্ডের দুপাশে গাঢ় বাদামী রঙের **যকৃৎ** এবং যকৃতের মধ্যখণ্ডের উপর সবুজ রঙের গোল থলির মতো **পিত্তাশয়** দেখা যায়। যকৃতের নিচে ফোলা লাল্‌চে বেলুনের মতো **ফুসফুস** দুটি ঢাকা থাকে। যকৃতের বাঁদিকের, এবং যকৃৎ দিয়ে আংশিক ঢাকা লম্বাটে থলির মতো অঙ্গটি **পাকস্থলী**। পাকস্থলীর সঙ্গে যুক্ত সরু নলের মতো অংশটি **ক্ষুদ্রান্ত্র**। এর প্রথম অংশ পাকস্থলীর সঙ্গে প্রায় সমান্তরালভাবে থাকে। এই অংশের নাম **গ্রহণী**। গ্রহণী এবং পাকস্থলীর মাঝে হাল্‌কা হলুদ রঙের **অগ্ন্যাশয়** দেখা যায়। ক্ষুদ্রান্ত্রের বাকী প্যাঁচালো এবং লম্বা অংশের নাম **নিম্ন ক্ষুদ্রান্ত্র**। একটি পাতলা পর্দা দিয়ে নিম্ন ক্ষুদ্রান্ত্রের প্যাঁচগুলি পরস্পর আট্‌কানো থাকে। এই পর্দাটি কেটে

বাদ দিতে হয়। ক্ষুদ্রান্ত্রের শেষে যুক্ত যে মোটা নলের মতো অঙ্গ দেহ-গহ্বরের পিছনদিকে থাকে, তার নাম **মলাশয়**। মলাশয়ের গায়ে পাতলা পর্দা দিয়ে একটি গোল কাল্‌চে লাল রঙের অঙ্গ যুক্ত থাকে। এটি প্লীহা। দেহ-গহ্বরের শেষভাগে ঈষদচ্ছ একটি থলির মতো অঙ্গ থাকে। এর নাম **মূত্রাশয়**। মূত্রাশয়টি **অবসারনী** নামের অঙ্গের গহ্বরে যুক্ত। পাকস্থলী এবং ক্ষুদ্রান্ত্র এক পাশে সরিয়ে দিলে, পৃষ্ঠ-মধ্যরেখার দুপাশে দুটি চ্যাপ্টা, লম্বাটে, লাল্‌চে অঙ্গ দেখা যায়।




58 নং চিত্র— কুনো ব্যাঙের **আন্তরযন্ত্র** (হৃৎপিণ্ড এবং যকৃৎ উল্টানো)।

এদের নাম **বৃক্ক**। বৃক্ক দুটির বাইরের প্রান্ত থেকে উৎপন্ন **গবিনী** নামের দুটি ঈষদচ্ছ নলের মতো অঙ্গ দেহ-গহ্বরের পিছনদিকে চলে যেতে দেখা যায়। বৃক্ক দুটি পাতলা পর্দা দিয়ে ঢাকা থাকে। ঐ পর্দা কেটে বাদ দিতে হয়। বৃক্ক দুটির সামনের প্রান্তের সঙ্গে ছোট আঙুলের মতো কয়েকটি অংশ আট্‌কে থাকতে দেখা যায়। এদের নাম **মেদপুঞ্জ**। কুনো ব্যাঙটি স্ত্রী-ব্যাঙ হলে, প্রতিটি বৃক্কের সঙ্গে বড়,

কালো রঙের থলির মতো দুটি অঙ্গ লেগে থাকতে দেখা যায়। এরা **ডিম্বাশয়**। প্রতিটি বৃক্কের বাইরের দিকে একটি করে প্যাঁচালো, সরু নলের মতো অঙ্গ দেখা যায়। এরা **ডিম্বনালী**। পুরুষ-কুনো ব্যাঙের ক্ষেত্রে, বৃক্ক দুটির সঙ্গে সাদাটে বেলনাকার **শুক্রাশয়** যুক্ত থাকে। শুক্রাশয় দুটির সামনের দিকে দুটি ছোট গোল গোল অঙ্গ বৃক্কের গায়ে লেগে থাকে। এদের নাম **বিডার্‌-এর অঙ্গ**।

ব্যবচ্ছেদ করা হয়ে গেলে, ট্রে'র অপরিষ্কার জল ফেলে দিয়ে, পরিষ্কার জল ভরে নিতে হয়। এরপর, সাবান দিয়ে ভালো করে হাত ধুয়ে, ব্যবচ্ছেদের একটি ছবি আঁকতে হয়। ছবি আঁকার সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যেন, বিভিন্ন অঙ্গের আপেক্ষিক অবস্থান এবং আকার যতদূর সম্ভব যথাযথ হয়। ছবি আঁকা হয়ে গেলে, বিভিন্ন অঙ্গ চিহ্নিত করতে হয়।

---

# জীবন-বিজ্ঞান প্রবেশিকা

